প্রথম অধ্যায়

নিম্নবর্গ সংজ্ঞা- সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য- নিম্নবর্গ ও প্রতাপ- সাহিত্যিক প্রকাশ

নিম্নবর্গ ও সংজ্ঞা ঃ

"কেহ মরে বিল ছেঁচে, কেহ খাই কই।"[১]

নিম্নবর্গ **(Subaltern)** এর আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের উক্ত উদ্ধৃতিটি অনেকাংশে প্রযোজ্য। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর এই উক্তির মধ্য দিয়ে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের মাধ্যমে সমাজের উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের স্বরূপটিকে তুলে ধরেছেন। আবার -

"ছোটলোকের দুঃখে কাতর! ছি! কে হইবে?"[২]

তাঁর এরকম শ্লেষাত্মক **(Satire)** ও বক্রোক্তি **(Irony)** ধর্মী মন্তব্যে এখন আমাদের ভাবার সময় এসেছে **'Philosophy of Subaltern'** অর্থাৎ নিম্নবর্গীয় দর্শন কী? **Subaltern** কথাটির অর্থ খুঁজতে গেলে দেখা য়ায়—

> **"Subaltern : a commissioned officer under The rank of captain."** [৩]
>
> (ক্যাপ্টেনের অপেক্ষা নিম্নপদস্থ সেনাপতি বিশেষ)

ইতালির কমিউনিস্ট নেতা ও দার্শনিক আনতোনিও গ্রামসির (১৮৯১-১৯৩৭) বিখ্যাত কারারচনায় **(Prison Notebooks)** সাব-অলটার্ন বা নিম্নবর্গ শব্দটির ব্যবহার হয়। শ্রেণি বিভক্ত সমাজে দুটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিকে গ্রামসি সাবলটার্ন শব্দটি ব্যবহার করেছেন। একটি সরাসরি 'প্রলেটারিয়েত' অর্থাৎ পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় সাব-অলটার্ন শ্রেণি হল শ্রমিক শ্রেণি। সামাজিক

ক্ষমতার এক বিশেষ ধরণের বিন্যাস ও প্রক্রিয়ার মধ্যে শ্রমিক শ্রেণি শোষিত ও শাসিত হয়। আর এই সাব-অলটার্ন শ্রমিক শ্রেণির বিপরীত মেরুতে অবস্থিত 'হেজেমনিক' শ্রেণি অর্থাৎ উচ্চবর্গ, ক্ষমতাসম্পন্ন, পুঁজিমালিক শ্রেণি। শ্রমিক শ্রেণি অর্থে সাবলটার্ন; পুঁজিমালিক বুর্জোয়া শ্রেণি অর্থে হেজেমনিক শ্রেণির সামাজিক আন্তঃসম্পর্কের বিষয়ে গ্রামসির বিশ্লেষণ আধুনিক মার্কসবাদী আলোচনায় এক বিশিষ্ট অবদান।

> *"সাব-অলটার্ন শব্দটি মার্কস-পন্থী গ্রামসি ব্যবহার করেছিলেন 'প্রলেতারিয়েত'-এর প্রতিশব্দ রূপে। পুঁজিবাদী সমাজে অর্থনীতি যেখানে মূল মেরুদন্ড এবং মালিক শ্রেণি যেখানে ক্ষমতার শীর্ষে অবস্থান করে, সেখানে সাব-অলটার্ন হল শ্রমিক শ্রেণি। এখানে শ্রমিক ও মালিক উভয়ে বিপরীত মেরুপ্রান্তবাসী এবং উভয়ের সম্পর্ক শোষণের সঙ্গে সম্পর্কিত। গ্রামসি সাব-অলটান শব্দটিকে আরও বিস্তৃত অর্থে দেখেছেন। প্রভুত্বের অধিকারী মানুষরা প্রভুত্ববাদী বা 'ডোমিন্যান্ট' শ্রেণির এবং এদের অধীন সমস্ত অসহায়, রুদ্ধবাক নিরুচ্চার প্রতিবাদহীন মানুষরা হলেন সাব-অলটার্ন।"* [৪]

শ্রেণিবিভক্ত সমাজ ব্যবস্থায় অন্যান্য ক্ষেত্রেও গ্রামসি 'সাব-অলটার্ন' কথাটি ব্যবহার করেছেন। যেখানে সমাজ বিন্যাসের এক মেরুতে আছে 'ডমিন্যান্ট শ্রেণি' আর অপর মেরুতে আছে সাব-অলটার্ন শ্রেণি। সাধারণ ভাবে সাব-অলটার্ন কথাটি 'নিম্নস্থিত' বা 'অধস্তন' অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। সাব-অলটার্ন এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে নিম্নবর্গ শব্দটি ব্যবহার করেন ইতিহাসবিদ রণজিৎ গুহ। রণজিৎ গুহ এই 'নিম্নবর্গ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন

‘এক্ষণ’ পত্রিকায় ‘নিম্নবর্গের ইতিহাস’ শীর্ষক প্রবন্ধে।

নিম্নবর্গের সংজ্ঞা নিরুপণে প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ‘এক্ষণ’ পত্রিকায় প্রকাশিত ‘রণজিৎ গুহর’- ‘নিম্নবর্গের রাজনীতি ও ইতিহাস বিদ্যার দায়িত্ব’- নামক দ্বিতীয় বক্তৃতা। তাঁর বক্তব্যের বিষয়বস্তু এরকম— উচ্চবর্গ বলতে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন তাদেরই, যারা ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষে প্রভুশক্তির অধিকারী ছিলেন। রণজিৎ গুহ এই প্রভুস্থানীয়দের দু-ভাগে ভাগ করেছেন দেশি ও বিদেশি। বিদেশি প্রভুগোষ্ঠীর মধ্যে যারা গণ্য তারাও দু-ধরনের, সরকারি ও বেসরকারি। সরকারি বলতে গণ্য ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের অভারতীয় কর্মচারী ও ভৃত্য সকলেই, আর বেসরকারি বলতে গণ্য বিদেশীদের মধ্যে যারা শিল্পপতি, বণিক, অর্থব্যবসায়ী, খনির মালিক, জমিদার, নীলকুঠি, চা বাগান, কফিক্ষেত বা ওই জাতীয় যে সব সম্পত্তি প্লানটেশন প্রণালীতে চাষ করা হয় তাদের মালিক ও কর্মচারী, খ্রিষ্টান মিশনারী, যাজক, পরিব্রাজক ইত্যাদি।

আজ একবিংশ শতকের প্রথম দশকে দাঁড়িয়ে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার চেহেরাটি দেখলে বিস্মিত হতে হয়। সেই এক গোষ্ঠী বা দলভুক্ত সমাজ, আজ বিভিন্ন দল বা গোষ্ঠীতে পরিণত। ধনী-দরিদ্রের পার্থক্যটাও আকাশ-পাতাল সদৃশ। এদিকে গগনচুম্বী আলোকজ্জ্বল অট্টালিকা, পাশাপাশি অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে অন্ধকারে নিমজ্জিত সারি সারি বস্তির সহাবস্থান। মুষ্টিমেয় ধনী সম্প্রদায়ের বিলাসবহুল জীবনযাত্রার মধ্যে লক্ষ লক্ষ গৃহহীন, অভুক্ত, রোগক্লিষ্ট, কুসংস্কারগ্রস্থ, অসহায় মানুষের অসহায় কান্না - বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় তৈরি নাগরিক জীবনের এক নগ্ন কুৎসিত ছবি। অর্থনৈতিক অসাম্যের কারণে বঞ্চিত, শোষণ ও স্বার্থপুষ্ঠ শ্রমিকনীতির জন্য নিপীড়িত, পক্ষপাতদুষ্ট, বৈষম্যমূলক শাসনব্যবস্থার বলি হয়ে দলিত হয়েছে। ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থার শিকার হয়েছে। শিক্ষা ও সভ্যতার আলোক থেকে নির্বাসিত সর্বোপরি কুসংস্কারগ্রস্থ ধর্মান্ধতার বলি হয়ে অচ্ছ্যুৎ বা অস্পৃশ্য হয়েছে। এই বঞ্চিত শ্রেণি, সমাজের মূলস্রোত

ঞ্চ্ঞ্ঞ্— (ঠ্ঠত্রত্রদ্ব দ্র (দ্রত্বত্রন্থ্ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। এই পিছিয়ে পড়া অনুন্নত ক্ষ্খত্বদ্ধন্দ্রখন্ত্ব যেমন— দলিত, শোষিত, নিপীড়িত তথাকথিত অচ্ছ্যুৎ মানবগোষ্ঠীকে এক কথায় নিম্নবর্গ আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় সমাজে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে অর্থনৈতিক দিক থেকে। সমাজতত্ত্বের অন্যতম পথিকৃত কার্ল মার্কস শ্রেণিনির্ধারণ করেছেন উৎপাদন ব্যবস্থার দিক থেকে। শ্রেণি নির্ধারণের ক্ষেত্রে মার্কসের প্রধান মাপকাঠি অর্থনৈতিক। জমিদারি, মহাজনি শাসন ব্যবস্থায় গরিব চাষি, কৃষকদের, আধিয়ারদের দুর্দশা আরও চরম সীমায় চলে যায় যখন অষ্টাদশ শতকে ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব দেখা দিল। এই শিল্প বিপ্লব আর্থ-সামাজিক বিবর্তনের মধ্যদিয়ে সমাজ জীবনে আর একটি ভেদরেখা টেনেছে। ধনতান্ত্রিক সমাজে কলকারখানা প্রসারের ফলে সমাজে শ্রমিক শ্রেণির উদ্ভব ঘটেছে। গ্রামীণ জীবনযাত্রায় এর ফল হয়েছে মারাত্মক। কৃষি প্রযুক্তিতে শুধু আধুনিকীকরণই ঘটেনি গ্রামের খেটে খাওয়া বিভিন্ন বৃত্তিজীবী মানুষগুলি কলকারখানার শ্রমিকে পরিণত হয়েছে।

আবার নিম্নবর্গের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে বিপ্লব মাজীর চিন্তাধারা অন্য মাত্রা রাখে-

> *"ইতিহাস বদলে যায় সময়ের পাললিক চাপে। ভবিষ্যৎ প্রতিনিয়ত বর্তমানের মাটিতে দাঁড়িয়ে বেরিয়ে আসে অতীতের খোলস ছেড়ে। উৎপাদন সম্পর্ক, জৈবতার সম্পর্ক, প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থানের সম্পর্ক অনুসারে উচ্চ - নিম্ন, বিত্ত-বর্গের পর্যায় সারণী অনুসারে তৈরী হতে থাকে ভিন্ন এক মানদন্ড। আর সেই আর্থ-সমাজ-সাংস্কৃতিক কিংবা জৈবতা যৌনতার মানদন্ড তৈরি হয়েছে বহমান*

সময়ের বহু আলোচিত এক ডিসকোর্স; বর্তমান পরিভাষায় 'সাব-অলটার্ন' - যার নাম।'' [৫]

ইতিহাস কখনও নৈর্ব্যাক্তিক বা নিরপেক্ষ নয়। কেননা, কোনও সমাজ সচেতন বা সমাজে বসবাসকারী মানুষের পক্ষে শ্রেণি বিভাজনের নিরপেক্ষতা বজায় রেখে ইতিহাসের সত্য তুলে ধরা সম্ভবপর নয়। শিল্প বিপ্লব, দুটো বিশ্বযুদ্ধ, বিশ শতকের তিরিশের দশকের অর্থনৈতিক মান্দা, ঠান্ডা যুদ্ধ, আরব ভূখণ্ডে তৈল সমসা, ঔপনিবেশিক ক্ষমতাবানদের হাত থেকে এশিয়া-আফ্রিকা বিভিন্ন দেশের যুক্তি, ফ্রান্সে '৬৮-র ছাত্র আন্দোলন ইত্যাদি ঘটনাবলী ইতিহাসের তত্ত্বগুলির উপর প্রভাব ফেলতে থাকে। বিশ শতকের আটের দশক পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে উচ্চবর্গ ও এলিট সম্প্রদায়রাই শাসন ও আধিপত্য বিস্তার করেছে। নব চেতনায় একদল তরুণ ঐতিহাসিক, তারা মনে করলেন বুর্জোয়া সামন্ততান্ত্রিক যুক্তিবাদের উন্নত সংস্করণ হল 'মার্কসবাদী ইতিহাস চর্চা'। এরা হলেন - রণজিৎ গুহ, জ্ঞানেন্দ্র পান্ডে, ডেভিড হার্ডিম্যান, শাহিদ আমিন, ডেভিড আরনল্ড, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, দীপেশ চক্রবর্তী, গায়ত্রী চক্রবর্তী (স্পিভ্যাক), গৌতম ভদ্র, প্রমুখ ইতিহাসবিদেরা ইতিহাস ও নিম্নবর্গ ধারণার আন্তঃবৈষয়ীক গভীর আলোচনা করেন। ১৯৮২ সালে এরা 'সাব-অলটার্ন স্টাডিজ' এর প্রথম খন্ড প্রকাশ করলেন। নিম্নবর্গের ইতিহাস রচনার মধ্যদিয়ে নিম্নবর্গীয় সাধারণ মানুষের চোখে ইতিহাসকে দেখার, জানার সুন্দর অবলম্বন তৈরি করলেন উক্ত ইতিহাসবিদ গবেষকগণ।

ভারতের মতো কৃষিপ্রধান দেশে, যেখানে পশ্চিমি দেশের মতো সামন্ততান্ত্রিক বুর্জোয়া শ্রেণির বিরুদ্ধে বিপ্লবে, প্রতিবাদে নামেনি সেখানে উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের অবস্থান তো পরিস্কার ভাবে চোখে ধরা পড়ছে। তাছাড়া এই উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের মধ্যে স্তরভেদ থেকে গেছে। এইসব নিম্নস্তরের নিম্নবর্গীয় মানুষের অবদমিত, শোষিত, বিপর্যস্ত কণ্ঠস্বর শোনাতে চাইলেন

'সাব-অলটার্ন' তাত্ত্বিকেরা। ইতালির সাম্যবাদী আন্দোলনের নেতা তথা দার্শনিক আনতোনিও গ্রামসির দর্শন থেকে সাব-অলটার্ন পাঠ এর শুভ সূচনা। নিম্নবর্গীয় মানুষের শোষণের, লাঞ্ছনার, বঞ্চনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও সংগ্রামের যে ইতিহাস তা অন্ধকারে তলিয়ে গেছে। সেই তলিয়ে যাওয়া ইতিহাসকে তুলে আনার চেষ্টা করলেন আনতোনিও গ্রামসি। তবে নিম্নবর্গের বেশিরভাগ ইতিহাসই বিস্মৃতির অন্ধকারে, চিহ্নগুলিও অবলুপ্তি ঘটেছে। ভারতীয়দের আবিস্কৃত নিম্নবর্গীয় ইতিহাস চর্চা (সাব-অলটার্ন স্টাডিজ) বর্তমানে সারা বিশ্বজুড়ে চলছে। সাব-অলটার্ন ইতিহাস চর্চা নিয়ে নানান ডিসকোর্স ও তর্কবিতর্ক রচনা হচ্ছে। আজ সাব-অলটার্ন ইতিহাস চর্চার ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ভাষা-সাহিত্য-শিল্প-চলচিত্র-সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি নানান ক্ষেত্রে সাব-অলটার্ন ইতিহাসচর্চা রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে আলোচনার বিষয়। নিম্নবর্গের ইতিহাসে রাজা রাজত্বের কাহিনি থাকে না। নিম্নবর্গের বিষয়বস্তু হল, সাধারণ মানুষ, প্রান্তিক, আদিবাসী ও নারীদের প্রাত্যহিক জীবনবীক্ষা। তাদের উন্নয়ন ও অবনয়ন। তারা কেন তাদের বন্ধ্যাদশা কেটে বেরোতে পারছে না? নাকি তারা চাইছে না? নাকি উচ্চবর্গের ক্ষমতা ও রক্তচক্ষুর সামনে তারা সর্বদা ভীত সন্ত্রস্ত? এর রহস্য কী? তা উদ্‌ঘাটনই 'সাব-অলটার্ন স্টাডিজ' এক মূল বিষয়। আবার ভারতবর্ষের মতো দেশে ধর্ম কেন্দ্রিক নোংরা রাজনীতি কিভাবে উচ্চবর্গীরা আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম তারও আলোচনা এর মূল বিষয়।

জন্মগত দিক থেকে যারা নিম্নবর্গের, তারাই অর্থনৈতিক দিক দিয়ে শোষিত হয়ে এসেছে। এর ব্যতিক্রম হয়তো আছে। এদেশে সমাজে **'Open classs System'** প্রচলিত হওয়ার পর নিম্নবর্গের মানুষ বর্ণগত অভিশাপ থেকে কিছুটা মুক্তি পেয়েছে বলে মনে হয়। সেক্ষেত্রে নিম্নবর্গের মানুষ শিক্ষা-সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে বা বিবাহসূত্রে উচ্চবর্ণের সমাজে উঠে আসতে পারে। আবার বিপরীত চিত্র লক্ষ্য করা যায় যেখানে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির চাপে উচ্চবর্গের মানুষ নিম্নবর্গের অন্তর্ভূক্ত হতে পারে। প্রসঙ্গত বলা যায়

—ভারতবর্ষে স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে দেশভাগের ফলে, যে উদ্বাস্তু সমস্যা দেখা দেয়, সেই ছিন্নমূল মানুষগুলির মধ্যেই অনেকে নিম্নবর্গের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেছে। নিম্নবর্গের মানুষ, তার যন্ত্রণা, অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। যুগযুগ ধরে সমাজের উপরতলার মানুষগুলির বঞ্চনার অত্যাচারের শিকার এই নিম্নবর্গরা। জীবনধারনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এরা অপমানিত ও শোষিত।

> *"এই জন্যই জমিদার তাহাদিগকে মারিতেছে, মহাজন তাহাদিগকে ধরিতেছে, মনিব তাহাদিগকে গালি দিতেছে, পুলিস তাহাদিগকে শুষিতেছে, গুরুঠাকুর তাহাদের মাথায় হাত বুলাইতেছে, মোক্তার তাহাদে গাঁট কাটিতেছে আর তাহারা কেবল সেই অদৃষ্টের নামে নালিশ করিতেছে যাহার নামে সমন জারি করিবার জো নাই।"* [৬]

১৯৮২ তে সাব-অলটার্ন স্টাডিজ এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হবার পর বারো বছরে তাঁরা সাব-অলটার্ন স্টাডিজ এর আটটি খন্ড প্রকাশ করেন। বর্তমান বিশ্বে রকেট সায়েন্স-এর যুগে সারা বিশ্বজুড়ে সাব অলটার্ন স্টাডিজ এর চর্চা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

Subaltern (নিম্নবর্গ) ইংরেজি ভাষায় শব্দটি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয় সামরিক সংগঠনের ক্ষেত্রে। ক্যাপ্টেনের অধস্তন অফিসারদের সাব অলটার্ন বলা হয়। তবে শব্দটির সাধারণ অর্থ হল অধস্তন বা নিম্নস্থিত। সাধারণ অর্থে ইংরেজিতে এর সার্থক শব্দ হল সাব-অর্ডিনেট। আনতোনিও গ্রামসির বিখ্যাত কারারচনায় সাব-অলটার্ন শব্দের প্রয়োগ পাই। এর নোট বইতে বিভিন্ন শব্দের প্রয়োগ সম্পর্কে কিছু জটিলতা আছে। এটি রচিত হয়েছিল (১৯২৯-১৯৩৫) এর মধ্যে। গ্রামসি যখন মুসোলিনির কারাগারে বন্দী। আরও সাধারণ অর্থে সাব-অলটার্ন কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে গ্রামসির লেখায়। কেবল পুঁজিবাদী

সমাজব্যবস্থায় নয়, শ্রেণি বিভক্ত সমাজের অন্যান্য ঐতিহাসিক পর্বেও সাবলটার্ন শ্রেণির কথা বলেছেন গ্রামসি। স্পষ্টতই এখানে সাব-অলটার্ন এর অর্থ শুধু শ্রমিক শ্রেণি নয় বরং যে কোনও শ্রেণিবিভক্ত সমাজে ক্ষমতা বিন্যাসের কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্টের কথা উপস্থাপিত হয়েছে। এই বিন্যাসকে গ্রামসি দেখেছেন একটি সামাজিক সম্পর্কের আন্তঃপ্রক্রিয়ার মধ্যে। যার এক মেরুতে অবস্থিত রয়েছে প্রভুত্বের অধিকারী 'ডমিন্যান্ট শ্রেণি'; অপর মেরুতে যারা সেই প্রভূত্বের অধীনস্ত, স্বাধীনতা বিহীন বঞ্চিত 'সাব-অলটার্ন শ্রেণি'। বহু ক্ষেত্রেই অবশ্য গ্রামসি বিশেষ বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে কতৃত্ব, প্রভূত্ব, শাসন এই শব্দগুলিকে সমার্থক হিসাবে ব্যবহার করেছেন। ফলে কর্তৃত্বের অধিকার প্রভূত্বের অধিকার, শাসনের অধিকার এই ধারণাগুলির মধ্যে কোনও পার্থক্য আছে কি না? তা গ্রামসির আলোচনা থেকে বোঝার চেষ্টা করব।

গ্রামসির সাবলটার্ন স্টাডিজের আলোচনায় রাষ্ট্রের সঙ্গে নাগরিক সমাজের সম্পর্ক নিয়েও আলোচনা হতে থাকে। নাগরিক সমাজের মধ্যে বিভিন্ন জাতি-উপজাতির লোকেরা যেমন আছেন, বিভিন্ন শাসক গোষ্ঠী, বুর্জোয়া শ্রেণি, সামন্ততন্ত্র ক্ষমতার অধিকারি শাসকগণ আর আছে জনগণ। এদের পারস্পরিক সম্পর্ক সাব-অলটার্ন স্টাডিজ এর আলোচ্য বিষয়। জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় বুর্জোয়া কর্তৃত্বে বুদ্ধিজীবিদের ভূমিকা, মিডিয়ার ভূমিকার কথাও এসে যাচ্ছে। উৎপাদন সম্পর্কের ওপরই প্রভুত্ব ও অধীনতার সম্পর্ক নির্ভর করে। সামন্তশ্রেণির প্রভুত্ব, ক্ষমতা আর কৃষক, শ্রমিক শ্রেণিও অধীনতা, বঞ্চনা, লাঞ্ছনা। কৃষক-শ্রমিকের নিত্যদিনের ধ্যান-ধারনা, আচার-আচরণ, ধর্ম-বিশ্বাস, জীবন-যাপন, ও কৃষকশ্রেণির রাজনৈতিক সম্ভাবনা সম্পর্কে উচ্চবর্গের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য মনোভাব, সাব-অলটার্ন ইতিহাস চর্চার আলোচ্য বিষয়। শ্রেণি বিভক্ত সমাজে কৃষক চেতনা পরাধীন, অচল, প্রতিবাদহীন, নীরব। যে কোনো বিদ্রোহের সময় তাদের চেতনা শাসকশ্রেণির অন্যায়, অত্যাচারে, আবরিত হয়ে থাকে, যার ফলে তারা জোর সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে পারেনা এবং নিজেদের দূরবস্থার

সৃষ্টি করে। কৃষকচেতনার পরনির্ভরতা থাকলেও, তা ক্ষমাশালী প্রভূত্বের চেতনার বিপরীত বিন্দুতে অবস্থান করে। এই বিপরীত বিন্দুতে অবস্থানই কখনও কখনও কৃষক চেতনার অভ্যুত্থান ঘটায়। বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে বলেছেন—

> *"জীবের শত্রু জীব; মনুষ্যর শত্রু মনুষ্য; বাঙালী কৃষকের শত্রু বাঙালী ভূস্বামী।"* [৭]

শুধু তাই নয় যে কোনও শ্রেণি বিভক্ত সমাজে প্রভূত্ব অধীনতার এই সম্পর্কের সাধারণ চরিত্র নির্মাণ করতে গিয়ে অত্যন্ত কিছু মন্তব্য করা সত্ত্বেও এমন কয়েকটি তাত্ত্বিক সমস্যার মধ্যে পড়েছেন যার নির্দিষ্ট সমাধান তার লেখায় পাওয়া যায় না। উৎপাদক সম্পর্কের দিক থেকে বিচার করলে এই প্রভূত্ব অধীনতার সম্পর্কই স্বভাবতই নানা প্রকারের উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যেই নিহিত থাকতে পারে। তবে বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় ইতালীয় সমাজে পুঁজিবাদী বিকাশের অসম্পূর্ণতার পটভূমিতে সামন্তশ্রেণির প্রভূত্ব ও কৃষক শ্রেণির অধীনতার চরিত্রই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হিসেবে এসেছে গ্রামসির লেখার প্রভূত্ব অধীনতা সম্পর্কের সাধারণ চরিত্রটির সন্ধান করেছেন তিনি প্রধানত সংস্কৃত ও ভাবাদর্শের ক্ষেত্রগুলি। দুটি মূল ঝোঁক কাজ করেছে তাঁর মধ্যে একদিকে ইউরোপীয় মার্কসবাদের আদিপর্বে কৃষকের সংস্কৃতি ধ্যান-ধারনা, আচার-আচরণ ও রাজনৈতিক সম্ভাবনা সম্পর্কে যে তাচ্ছিল্য আর অবজ্ঞার ভাব। অপরদিকে তার বিরুদ্ধে গ্রামসি বলে গেছেন সাবলটার্ন কৃষকদের প্রাত্যহিক জীবন যাপন, ধর্মবিশ্বাস, রাজনৈতিক ধ্যান-ধারনার বৈশিষ্ট্য, লক্ষণগুলির কথা, বুদ্ধিজীবিদের পক্ষে এই লক্ষণগুলিকে গভীরভাবে অনুসন্ধান করা ও বোঝার প্রয়োজনের কথা। তাহলে গ্রামসি এত জোরের সঙ্গে কৃষকের প্রাত্যহিক জীবন যাত্রা ও ভাবাদর্শের জগৎটিকে পুঙ্খানুপঙ্খভাবে অনুসন্ধান করার প্রয়োজনীতার কথা বলেছেন কেন? খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে ঘটনাটি অত সরল নয়। গ্রামসি কৃষকের চেতনার সীমাবদ্ধতা এবং পরনির্ভরতার কথা বলেছেন ঠিকই কিন্তু

একই সঙ্গে একথাও বলেছেন যে,— যে কোনও শ্রেণিবিভক্ত প্রভূত্ব অধীনতা সম্পর্ক হল বিরোধীতার সম্পর্ক। ফলে তার পরনির্ভরতার মধ্যেও কৃষক চেতনা সামন্তশ্রেণি চেতনার বিপরীত বিন্দুতে অবস্থিত। এই বিরুদ্ধতার জন্য কৃষক চেতনার বাস্তব প্রকাশ সময় সময় ইতিবাচক ভূমিকাও গ্রহণ করতে পারে। লোকমানসে কিছু কিছু উপাদান যেমন আশ্চর্য রকমের শক্তিশালী বিশেষ করে এক ধরনের স্বাভাবিক নীতিবোধ কাজ করে, তার মধ্যে যা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম, ন্যায়শাস্ত্র বা আইনের তুলনায় অনেক সহজ অথচ গভীর এবং দীর্ঘস্থায়ী। এমনকি নতুন নতুন পরিস্থিতিতে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের নানা অভিনব পন্থার জন্ম দিতেও তা সক্ষম। সংস্কৃতি বা ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে লোকসংস্কৃতি যদিও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের চাপে ভারাক্রান্ত থাকে তা সত্ত্বেও সাবলটার্ন শ্রেণিগুলি তাদের নিজেদের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও প্রয়োজন অনুযায়ী সেই প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতির কিছু কিছু উপাদানকেই মাত্র বেছে নেয়, সবটুকু নেয় না। ফলে ধর্মীয় জীবনের সার্বিক প্রাতিষ্ঠানিক চেহেরার মধ্যেও এক ধরনের স্তর বিন্যাস দেখা দেয়। শাসকশ্রেণির ধর্মবিশ্বাস আর তাদের অধীন শ্রেণিগুলির ধর্মবিশ্বাস প্রাতিষ্ঠানিক দিক থেকে এক হলেও তাদের আকার ও চরিত্র পৃথক, এমনকি বিরোধী রূপও ধারণ করতে পারে। এই বিরুদ্ধতা থেকেই জন্ম নেয় সাবলটার্ন শ্রেণির প্রতিরোধ, যা বহুসময়ই ক্ষমতাসীন শ্রেণিগুলিকে বিপদে ফেলতে সক্ষম হয়।

গায়ত্রী চক্রবর্তী (স্পিভ্যাক) চাইলেন উচ্চবর্গের অপর স্বর হিসাবে নিম্নবর্গকে প্রতিষ্ঠা করতে। কারণ তিনি মনে করেন— নিম্নবর্গ কখনই তার নিজের কথা বলতে পারে না। তিনি বলেন ইতিহাসের হাজারো স্বরের মধ্যে থেকে নিম্নবর্গের স্বরকে তুলে আনা অসম্ভব। কারণ সেখানে যা পাওয়া যাবে তা খাঁটি নয়, অন্যের নির্মাণ। তিনি বলেন এই স্বরের সামাজিক পদ্ধতিগুলি, প্রক্রিয়াগুলি, প্রতিষ্ঠানগুলিকে বরং নিম্নবর্গের ইতিহাসবিদেরা আবিস্কার করুক।

এবং নিম্নবর্গের ইতিহাসবিদেরা নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে নিম্নবর্গের গবেষণা শুরু করলেন। নিম্নবর্গের সত্তা বা নিম্নবর্গের চেতনা ইত্যাদির আবিষ্কারের চেষ্টা করে নিম্নবর্গের চেতনার বিভিন্ন উপাদান আবিষ্কৃত করতে সচেষ্ট হলেন। অবশেষে এই ধারণায় উপনীত হওয়া গেল যে— নিম্নবর্গের ইতিহাস যে ডিসকোর্স শুরু করছিলেন ইতিহাসবিদেরা; সেখান থেকেই নানা নতুন নতুন পথ আবিষ্কৃত হতে শুরু করল। ডিকনস্ট্রাকশন বা বিনির্মাণ শুরু হয়ে গেল। এর আগে খোঁজ বা আলোচনা করা হত নিম্নবর্গের স্বরূপ কী? এখন বলা হয় নিম্নবর্গকে প্রতিনিধিত্ব করা হয় কীভাবে? অর্থাৎ প্রদর্শন বা রিপ্রেজেন্ট করা হয় কীভাবে? যখন এই প্রশ্ন উঠল তখন বোঝা গেল নিম্নবর্গের কোনো আদ্যপ্রান্ত ইতিহাস তৈরি করে পাঠকের সামনে তুলে ধরা সম্ভব নয়। তাই পরবর্তী পর্যায়ে নিম্নবর্গ নিয়ে গবেষণার পদ্ধতি ও জিজ্ঞাসা বেড়ে গেল। বদলে গেল গবেষণার পদ্ধতি। বিভিন্ন দলিলপত্রাটি ঘেঁটে, পুঁথিচর্চা, ধর্মচর্চা, গোষ্ঠীর সমাজবিধি নিয়ে নিম্নবর্গের স্বর আবিষ্কারের গবেষণা চলল। কারণ উচ্চবর্গের ক্ষমতাশালী ডিসকোর্সের মধ্যেই আত্মগোপন করে থাকে নিম্নবর্গের স্বর। ঔপনিবেশিক শাসনকালে প্রতিষ্ঠান, ইংরেজি শিক্ষা ব্যবস্থা, নবজাগরণ, জাতীয়তাবাদের উন্মেষপর্বে নিম্নবর্গের ভূমিকা কি ছিল? স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, সংবাদপত্র, প্রকাশন সংস্থা, হাসপাতাল, ডাক্তার-চিকিৎসা-ব্যবস্থা, জনসংখ্যা গণনা, রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স, শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থা, কর্পোরেট হাউস, সাইবার ক্যাফে, বিপিও, বিজ্ঞান সংস্থা, শ্রমিক সংগঠন, ইত্যাদি বিষয়ের ওপর গবেষণা করা। কারণ এইসব প্রতিষ্ঠান থেকেই উচ্চবর্গরা প্রভাব, ক্ষমতা ও আধিপত্য বিস্তার করে থাকে। আলোচ্য বিষয় হবে এসব স্থানে কীভাবে নিম্নবর্গকে নির্মাণ করা হয়? কীভাবে তাদের স্বর চাপা দেওয়া হয়? কীভাবে তাদের ক্ষমতায় না আসতে দিয়ে বঞ্চিত করে রাখা হয় ইত্যাদি বিষয়গুলি নিম্নবর্গের আলোচনার বিষয় হয়ে উঠল। ফলে নিম্নবর্গের গবেষণা ব্যাপকতায় বিস্তৃত হল।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট ঃ

আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নিম্নবর্গীয়রা হল— কৃষক, ক্ষেতমজুর, বিত্তহীন ভূস্বামী, শ্রমজীবি ইত্যাদি শ্রেণি সম্প্রদায়। এছাড়া বাংলার পটুয়া কিংবা ডোকরাদের মতো লোকশিল্পী মাতুয়া, সাহেব ধুনী, আউল-বাউলের মতো সম্প্রদায় কিংবা মাছমারা বৃত্তিভিত্তিক সম্প্রদায় ইত্যাদি এরা মূলস্রোতে থাকা আংশিক প্রান্তীক নিম্নবর্গের উদাহরণ। আর বোন্তা ও জারোয়াদের মতো জনজাতিরা সম্পূর্ণ প্রান্তির নিম্নবর্গের মানুষ। আর সামগ্রিকভাবে সমাজের মূল ধারা থেকে এরা বিচ্ছিন্ন। তবে বিশেষ আর্থ-সামাজিক কিংবা রাজনৈতিক কারণে সার্বিকভাবে উচ্চবর্গের প্রভূত্ব ও আধিপত্যের প্রশ্নে বিরোধ ও সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়। সময় বিশেষ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে, ভিন্নতা ও প্রতিবেশ ভেদে উচ্চ-নিম্ন কিংবা প্রান্তবর্গের মধ্যেকার প্রভূত্ব-অধীনতার' সম্পর্কের রূপ বদলে যায়। উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক শাসনাধীন ভারতীয় সমাজে প্রভূত্ব অধীনতার সামাজিক স্তরবিন্যাস দেখা যায়। প্রভূত্ব অধীনতার সর্বস্তরে রয়েছে শাসকরূপী প্রভুর দল।

বাংলা সাহিত্যে বাংলার সমাজ, সংস্কৃতি, বাস্তবাতকেই সাধারণভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এই বাস্তবতার মূল কাঠামোজাত ব্যবস্থা যা জাতি বর্ণ প্রথাকে সচল রাখতে সাহায্য করেছে। আর এতে প্রভূত্ব হিসাবে কাজ করেছে ক্ষমতাশীল বর্ণসমূহের নিরঙ্কুশ আধিপত্য। প্রাক্-আর্যযুগের ভারতবর্ষের মানুষের দ্বারা, মানুষের শোষণের বিশেষ নজির পাওয়া যায় না। যদিও মার্কসবাদী ইতিহাসবীক্ষা অনুসারে ব্যক্তি মালিকানা উদ্ভবের সাথে সাথেই জমির মালিকানার প্রশ্নকে কেন্দ্র করে একাংশ জনগণের দ্বারা, অপরাংশের জনগণকে অধিকারচ্যুত করে প্রান্তিকায়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। প্রাক্-আর্য ভারতবর্ষের জমির, সম্পদের, মালিকানার প্রশ্নকে কেন্দ্র করে বিরোধ ছিল না এমন কথা বলা যায় না। একালের জাতি-বর্ণ বিভাজিত সামাজিক বৈশিষ্ট্যের আদি উৎস হিসাবে

প্রাচীন ভারতে বিরাট সংখ্যক জনগণকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে শূদ্র নাম দিয়ে। বৈদিক সাহিত্যে অনার্য অধিবাসীদের যজ্ঞহীন বলা হয়েছে। ঋগ্বেদ যুগের শেষের দিকে বিজিত অনার্য গোষ্ঠীসমূহের আত্তিকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল। ঋগ্বেদের নানা সংকেত থেকে মনে হয় আর্য সমাজে 'চতুর্থ বর্ণ' মূলত বিজিত গোষ্ঠীর দাসেরা, যারা উৎপাদন মূলক কাজে যতখানি ব্যবহৃত হতো, তার থেকে বেশি কাজ করত গৃহভৃত্য হিসাবে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের সেবা করতো তারা। গবাদি পশুর সঙ্গে দাসেদের অবাধে হস্তান্তর করা যেতো। ভেঁড়া, গাধা, গবাদি পশু আর দাসেদের সমান মর্যাদা ঋগ্বেদে।

অপেক্ষাকৃত পরবর্তী বৈদিক যুগে, যখন পশুপালন বৃত্তির জায়গায় আর্য সভ্যতা এসেছে কৃষি ও চাষবাস; তখন প্রথম যুগের এইসব দাসেরা শূদ্রদের সঙ্গে এক হয়ে গেল। তবে শূদ্ররা বৃহৎ অর্থসমাজের সবচেয়ে উপেক্ষিত একটি বর্ণ বা বর্গ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। কৃষি বিস্তারের যুগে সমাজে শ্রমিক শূদ্ররা গৃহকর্ম থেকে কৃষিকাজের দিকে বেশি করে আসতে থাকে। শূদ্রদের জন্য আরও কঠোর দন্ডবিধান করেছে 'মনু'। 'মনুসংহিতা' যা পরবর্তীতে বঙ্গদেশের জাত-বর্ণ-প্রথা দৃঢ়ীকরণের ক্ষেত্রে স্মার্তদের আকরগ্রন্থ হিসাবে কার্যকরী হচ্ছে; তা শূদ্রদের সম্পর্কে সবচেয়ে নির্মম। শূদ্র যদি কোনো দ্বিজের নাম ও জাতি অবজ্ঞাভাবে উল্লেখ করে তবে দশ আঙুল পরিমাণ লম্বা একটি উত্তপ্ত লৌহশলাকা তার মুখে প্রবেশ করানো হবে। শিশুর নামকরণ অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে বর্ণবৈষম্যের প্রবর্তন করে মনু যা বলছেন তা শূদ্রদের ঘৃণিত অবস্থানই সূচিত করে। বলা হয়েছে ব্রাহ্মণদের নাম রাখা হবে মঙ্গলবাচক, বৈশ্যের ধনবাচক ক্ষত্রিয়দের বল বা শক্তি বাচক আর শূদ্রদের নাম যে কোনো ঘৃণ্য কিছু সূচিত করে। মনু এবং পূর্বতন ধর্মশাস্ত্র প্রণেতারা কেউই ব্রাহ্মণের শূদ্রাগমণ এবং শূদ্রনারী বিবাহে নিষেধাজ্ঞা জারি করেননি। শূদ্ররা পিতৃসম্পত্তির উত্তরাধিকার পাবেন না। স্বভাবতই ব্রাহ্মণ্যবাদী প্রতিবেদন ব্রাহ্মণদের ব্যাভিচারের ঢালাও সুযোগ দিয়ে

দিলেও বিবাহ কিংবা ব্যাভিচারের দায় স্বীকার না করার পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করেছেন।

নিম্নবর্গের মানুষকে অবদমিত করে রাখার হাজারো বিধিনিষেধ রয়েছে সংস্কৃতশাস্ত্র সাহিত্যে। ভাবলে বিস্মিত হতে হয়, যে বরাহমিহির প্রণিত আবাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিধানে বলা হয়েছে— ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রদের গৃহে যথাক্রমে পাঁচ, চার, তিন ও দুটি করে ঘর থাকবে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই মূল কক্ষের দৈর্ঘ্য ক্রম অনুযায়ী হবে। বৈশ্যরাও শূদ্রদের সীমানায় হারিয়ে গিয়েছিল গুপ্তোত্তর আমলে, যখন বেশি বেশি করে শূদ্ররা কৃষিকার্যে আসা শুরু করেছ। বৈশ্য ও শূদ্রদের মধ্যে সাক্ষ্য বিচারসভায় গ্রহণযোগ্য ছিল না মনু কিংবা কৌটিল্যের সময়ে। বিচারালয়ে আবেদনপত্র গ্রহণের ক্ষেত্রে বর্ণগত পরিচয় ছিল বিবেচ্য বিষয়। লক্ষ্য করার মতো যে, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মাবলম্বীরা যাঁরা ব্রাহ্মণ্য মতাদর্শের বিরুদ্ধে মূল্যবোধ পোষণ করেন, সংস্কৃত শাস্ত্র প্রণেতারা তাদের সর্বদাই শূদ্রবর্গ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। অর্থাৎ তাদের ভূমিকা ও ক্ষমতাকে প্রতিবেদনের জগৎ সরাসরি প্রত্যাখান করেছে। একমাত্র এক জায়গায়, রাজকার্যে শূদ্রদের অধিকারের কথা জানা যায়। 'মহাভারতের শান্তি' পর্বে আছে, রাজার আটজন মন্ত্রীবিশিষ্ট্য 'মণ্ডলে' থাকবেন চারজন ব্রাহ্মণ, একজন সূত এবং তিনজন 'সংযত ও বাধ্য' শূদ্র। লক্ষ্য করার মতা যে শূদ্রবর্গের মন্ত্রীদের হতে হবে 'সংযত' ও বাধ্য'। মহাভারতের শান্তি পর্বে কোনো কোনো ক্ষেত্রে শূদ্রদের সম্পর্কে উদার মনোভাব দেখা গেলে শূদ্রদের প্রতি বৈরি মনোভাবের চূড়ান্ত নিদর্শন 'মনুসংহিতা' প্রস্তাবিত শূদ্রের সংজ্ঞাকে 'শান্তিপর্ব' দৃঢ়ভাবেই সমর্থন করেছে। সেখানে বলা হয়েছে শূদ্র হল—'সে, যার মধ্যে ধর্মের বিলয় ঘটে।' শুধু ধর্মীয় জীবনে নয় সামাজিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও নিম্নতর বর্ণসমূহের কোনো মর্যাদায় ছিল না। প্রেক্ষাগৃহ, অভিনয়-শালা ইত্যাদিতে শূদ্রের মানবিক মর্যাদা নেই। ভারতের নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে, অভিনেতা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় হলে তার গাত্রবর্ণ হবে লোহিত এবং বৈশ্য ও শূদ্রদের জন্য

গাঢ় নীল রঙ। প্রেক্ষাগৃহে নিম্নবর্গের জন্য চিহ্নিত হবে স্বতন্ত্র আসন। নাট্যশাস্ত্র আরো বলেছে, ভৃত্যজাতীয় চরিত্রে যাঁরা অভিনয় করবেন, সেই অভিনেতাদের শরীরের এক-পা, বা মাথা বা হাত পা অবনত থাকে।

ধর্মকে আশ্রয় করে বাংলা সাহিত্যের উন্মেষ ঘটলেও নিম্নবর্গের মানুষ সেখানে উপেক্ষিত নয়। নিম্নবর্গের আলোচনায় বাংলা সাহিত্যের আদিযুগ মধ্যযুগ ও প্রাক্ স্বাধীন আধুনিক যুগের সংক্ষিপ্ত প্রসঙ্গ আনা যেতে পারে। বাংলা সাহিত্য জন্ম নিয়েছিল ধর্মের পথ ধরে চর্যাপদের রূপকের আড়ালে। তার পরবর্তী দুইশত বছর বাংলা সাহিত্য নীরব থেকেছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে তূর্কি আক্রমণ শুধু বাঙালির ইতিহাসের গায়ে কলঙ্ক লেপন করেননি, দুইশত বছর ধরে বাঙালির সাহিত্য রস পিপাসাকে অবরুদ্ধ রেখেছে। তবুও এই সার্বিক সঙ্কট মুহূর্তে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে প্রাচুর্যে। মধ্যযুগের সাহিত্যে নিম্নবর্গ আলাদা মাত্রা পায়। মধ্যযুগের সাহিত্যে ধর্মের আবরণ ভেদ করে বেরিয়ে আসার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় সমাজের নিম্নস্তরের মানুষের মধ্যে। অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করি শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের রাখাল নায়ক ও গোপবালা নায়িকাকে, দেবীচণ্ডীর বরপুত্র ও পুত্রী, কালকেতু ও ফুল্লরাকে, দেবী মনসার সখী নেতা ধোপানীকে, রামায়ণ-মহাভারতে গুহক, একলব্য, কর্ণকে, কৃষক শিবকে, ঈশ্বরী পাটনীকে —এমন বহু চরিত্রকে। এ ছাড়া আছেন ডোম সমাজের পূজিত ধর্মঠাকুর, অন্যদিকে আছে, শ্রী চৈতন্যের মানবধর্ম, লোক সাহিত্যের লোকজীবনের টুকরো ছবি।

চর্যাপদ ঃ দশম-দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত হয়েছিল চর্যাপদগুলি। বৌদ্ধধর্মের অন্তর্গত বজ্রযান ও সহজযানের সাধন ও দর্শনতত্ত্ব যে রূপকের প্রহেলিকার আশ্রয়ে রচিত হয়েছিল, সেই রূপক ও চিত্রকল্পগুলি সাধারণ সমাজজীবন থেকে গৃহিত, আর এই সমাজের নিম্নবর্গের মানুষের হাজিরাই বেশি। এখানে চর্যার ধর্মতত্ত্ব ও রূপক বা চিত্রকল্প ব্যবহারের কারণ আলোচনা

অর্থহীন। কিন্তু রূপক ও চিত্রকল্পগুলি ব্যবহারের ফলস্বরূপ তখনকার সমাজজীবনের যে খণ্ড খণ্ড চিত্র ধরা পড়েছে-সে সমাজচিত্র থেকেই নিম্নবর্গের মানুষের সন্ধান পাওয়া যায়। কৃষিনির্ভরতার যুগে বাণিজ্যের অপ্রতুলতার কারণে সমাজের শ্রমিক শ্রেণির ব্যক্তিত্বেও ভাটা পড়ল। নিম্নবর্গের শর্বর, ডোম্বী, চন্ডালেরা বৌদ্ধ ধর্মকে আশ্রয় করতে চাইল। ব্রাহ্মণ্যধর্মের ছুৎমার্গের শিকার তারা হতে চাইল না। 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'-এর প্রাপ্ত সাড়ে ছেচল্লিশটি পদের রচয়িতাদের মধ্যে অনেকে ছিলেন নিম্নবর্গের অন্তর্গত। অনেকে আবার নিম্নবর্গের সাহিত্যিকেরা ছদ্মনাম ব্যবহার করেছিলেন। চর্যার পদকর্তাদের মধ্য কেউ কেউ যেমন —ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, রাজপুত্র, রাজপুরুষ, কায়স্থ, করণিক ছিলেন, তেমনি—দু চারজন নিম্নবর্গ থেকেও এসেছিলেন। শর্বরী পা, কঙ্কন পা, তন্ত্রী পা এরা জন্মের দিক থেকে ছিলেন শূদ্র। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, চর্যার বেশ কয়েকজন কবি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তবে তারা নিম্নবৃত্তিজীবির ছদ্মনাম গ্রহণ করছিলেন কেন? স্বভাবতই নিজেদের নাম ও বংশমর্যাদা চাপা দেওয়ার জন্য এবং বৌদ্ধ বিদ্বেষী ব্রাহ্মণ সমাজের চোখ খুলে দেবার জন্য ছদ্মনামের রূপক গ্রহণ করেছিলেন।

চর্যার সমাজচিত্রে নিম্নবর্গের মানুষের উপস্থিতির সংখ্যা বেশি। তাই মানুষগুলো সমাজের বাইরে, পর্বতের টিলায় বাস করত। এরা তাঁত বুনত, নৌকা চালাত, হরিণ শিকার করত, ডোমনারীরা পাটনীর কাজ করত, বেত ও বাঁশের চুপড়ী তৈরি করত। চাষি, তাঁতি, ধুনুরী সম্প্রদায়ের মানুষের কথাও চর্যাপদে আছে। চর্যাপদে ৩ নং চর্যায় রয়েছে শুঁড়ি নারীর চিত্র। সে চিকন বাকলে মদ তৈরি করে রাখে। '১০ নং' পদে নীচ জাতির ডোম্বী নারীর প্রেমে মত্ত হয়ে আশ্চর্য কাহ্নপা জাতপাতে আভিজাত্য বিলিয়ে দিয়েছেন। '১৪ নং পদে' ডোম নারীর নৌকা বাওয়ার চিত্র ও '১৮ নং পদে' ডোম নারীর আসঙ্গ। '১৯ নং পদে' কাহ্ন ডোম্বীর বিবাহ। ২০ নং পদে শিকারের চিত্র। ২৫ নং

পদে তাঁতিদের বয়ন কৌশল। ২৬ নং পদে তুলা ধোনার ছবি। ২৮ নং পদে শবর শবরীর চিত্র। '৪৫ নং পদে' ছুতোরের উল্লেখ ইত্যাদি। এ সবই হচ্ছে চিত্র; কোনো চরিত্র নয়। কিন্তু এই চিত্রে চর্যার সময়কার সমাজে নিম্নবর্গের জীবনযাত্রার একটা আভাস পাওয়া যায়। এটা কিন্তু কম তথ্য নয়। ইতিহাস যাদের উপেক্ষা করে এসেছে, সেই উপেক্ষিত শূন্যস্থান পূরণের দায়বদ্ধতা সাহিত্যের না থাকলেও, সাহিত্যের নিজস্ব চলনের মধ্য দিয়ে মাঝে মাঝে ইতিহাসে উপেক্ষিত সেই অন্ত্যজ মানুষের চিত্র ধরা পড়ে। যেমনটি ধরা পড়েছে চর্যাপদে।

মধ্যযুগ ঃ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ধর্মের আশ্রয়ে মানবজীবনের কথা বর্ণিত হয়েছে, আর সেই মানুষগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সমাজের নিম্নবর্গস্থিত, চিরঅবহেলিত মানবসম্প্রদায়। মধ্যযুগের বিরাট ব্যপ্তির মধ্যে, মঙ্গলকাব্য অনুবাদ সাহিত্য লোকগাথা ও গীতিকা-বৈষ্ণব সাহিত্য-মুসলমানি সাহিত্য খুঁজলে এই ধরনের বহু চরিত্রের সন্ধান মিলবে, আর তার মধ্য থেকে মধ্যযুগের সমাজীবনে নিম্নবর্গস্থিত মানুষের চেহেরাটা উঠে আসবে; সেই জাতের বিচার বর্ণ ভেদাভেদের চিত্র মিলবে। মূল আলোচনার ভূমিকা হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত একটু ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব।

মধ্যযুগের শুরুতেই বড়ুচন্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের নায়ক-নায়িকা এবং রাধা বিষ্ণু ও লদীর অংশাদ্ভুত হলেও মর্ত্যজন্মে তাদের গোপানয়ক নায়িকা ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না। 'কৃত্তিবাসি-রামায়ণে' নিষাদরাজ গুহকের প্রসঙ্গটি উল্লেখযোগ্য, এখান আর্য-অনার্য মিলন সংঘটিত হয়েছে। নিম্নবর্গের মানুষ চিরকালই দাস হয়ে সেবা করতে অভ্যস্থ, আর ভদ্র সম্প্রদায় তাদের কার্যসিদ্ধির সার্থে কাজ লাগাতে অভ্যস্থ। এই অভ্যাস বহুদিন ধরে চলে আসছে সমাজে। 'শিবায়ন' কাব্যে শিবের কৃষকরূপ ও দূর্গার বাগদিনী রূপ ধারণ লক্ষ্য করা যায়—

"আর্যেতর অষ্ট্রিক গোষ্ঠীভুক্ত আদি বঙ্গবাসিদের সমাজ তখন মূলতঃ কৃষিনির্ভর ছিল; তখন সেই দূরাস্তৃত অতীতের কৃষক সমাজের যে ধরনের কৃষিদেবতার পরিকল্পনা হয়েছিল, বহু শতাব্দী পরেও তার ক্ষীণ ধ্বংসাবশেষ এদেশে বজায় ছিল। পরবর্তীকালে পৌরানিক শিব এবং আদিম কৃষি সংস্কৃতির কোনো অমার্জিত স্থূল দেবতাকে সংমিশ্রিত করে শিবায়ন কাহিনিগুলি গড়ে উঠেছিল।" [৮]

'মনসামঙ্গল'এ দেবী মনসা তার সহচরী নিম্নবর্গের ধোপানী নেতার সহায়তায় নিম্নবর্গের সমাজে প্রথমে পূজা প্রচার করেছেন। চাষি-জেলে-রাখাল-মাঝি এই নিম্নশ্রেণির সমাজে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পর তাকে চিত্তশালী সমাজের কথা ভাবতে হয়েছে। মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল ১৬ শতকে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব। শ্রীচৈতন্যের সর্ব ধর্মাবলম্বী মানবতার মন্ত্র সকল মানুষকে একই বাতাবরণে ঢাকবার চেষ্টা করেছিল। সেখানে উচ্চ-নীচ, স্ত্রী-পুরুষ, জাত-বেজাত কোন কিছুই ভেদাভেদ নেই। নিম্ববর্গের মানুষের কাছে এ এক পরম আশ্রয়। কৃষ্ণের নাম শ্রবণকালে চন্ডাল আর চন্ডাল থাকে না, অশুচিত্ত শুচিশুদ্ধ হয় যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এমনই এক মানবতার প্রতীক উদাহরণ হজরত মুহম্মদ (সাঃ আঃ অঃ সাঃ) আজ থেকে প্রায় ১৪০০ বছর পূর্বে আরব মক্কা নগরীতে জাত-পাত, উচ্চ-নীচ, কালো-সাদা, মালিক গোলাম ইত্যাদি অমানবিক সমস্যা থেকে সমাধানের পথ নির্দেশ করেছিলেন।

'চন্ডীমঙ্গলের' 'আখেটিক খন্ডে' পাওয়া যায় নিম্নবর্গের নায়ক-নায়িকা কালকেতু-ফুল্লরাকে। কালকেতু রাজা হলেও নিম্নবর্গে থেকে উঠে এসেছে।

তাই ভদ্র সমাজ থেকে আগত ভাঁড়ুদত্ত কালকেতুর উদ্দেশ্যে বলার সাহস রাখে ঃ

"হরিদত্তের বেটা হই জয়দত্তের নাতি।
হাট লইয়্যা বেচাইব বীরের ঘোড়া হাতি।।
তবে সুশাসিত হবে গুজরাট ধরা।
পুনর্ব্বার হাটে মাংস বেচিবে ফুল্লরা।" [৯]

আবার ধর্মঠাকুরের পূজার আদি পুরোহিত হিসাবে প্রচারিত আছ রামাই পন্ডিতের নাম। তাঁর সম্বন্ধে প্রচলিত একটি কাহিনি থেকে জানা যায়, তিনি তাঁর পুত্রকে অভিশাপ দিয়েছিলেন— *"হইবি ডোমের পুরোহিত।"* [১০] —এ কাহিনি থেকে দেখা যাচ্ছে, রামাইয়ের পুত্র থেকেই ধর্মপূজকগণ ডোমের পুরোহিত হয়ে গিয়েছিলেন। 'ধর্মমঙ্গলের' কাহিনিতে আছে 'ডোম' সমাজের চিত্র। লাউসনের সেনাপতি কালুডোম ও তার পত্নী লখাই ডোমনী চরিত্রগুলি অপূর্ব দক্ষতার পরিচায়ক। ধর্মমঙ্গল কাব্যে নিম্নবর্গীয় শ্রেণিবিন্যাসের চিত্র খুঁজে পায়—

"নিম্নশ্রেণির চরিত্রগুলিই ধর্মমঙ্গলের কবিদিগের বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করিয়া রচিত। শৌর্যবীর্যে, কর্তব্যজ্ঞানে, ধর্মবুদ্ধিতে তাহাদের যে কোনো দিক দিয়া কোনো অভাব নাই; বৈষম্যমূলক সমাজে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াও সেই যুগের ব্রাহ্মণ কবিগণ ইহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁদের এই সমুন্নত ও উদার মানব চরিত্রের পরিকল্পনায় ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলি রাঢ়ের জাতীয় কাব্য হিসাবে সার্থকতার কারণ।"[১১]

যুগসন্ধিক্ষণের কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র ঈশ্বরী পাটনীর মুখ দিয়ে

দেবী অন্নপূর্ণার কাছ থেকে একটি বর প্রার্থনা করেছিলেন — *"আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।"* [১২]

মধ্যযুগের দেব-দেবীর আওতার বাইরে এসে গেলে দুধে ভাতে থাকা স্বপ্নও দেখতে পারে না নিম্নবর্গের মানুষ। এছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, মানিক, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, বনফুল, সুবোধ ঘোষ থেকে শুরু করে আধুনিককাল পর্যন্ত অর্থাৎ একেবারে একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত নানা সাহিত্যিকের রচনায় নিম্নবর্গের উপস্থিতি লক্ষ্য করার মতো। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিম্নবর্গ ও তাদের উপস্থিতির আকার-প্রকার-আবেদন ইত্যাদির পরিবর্তনও ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথের 'ওরা'; অক্ষয় দত্তের 'তাহারা'; কাজি নজরুলের 'কুলি-মজুর'; বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষিজীবী'; অভিজিৎ সেনের 'বাজিকর'; চাষি, শ্রমিক, নারী ইত্যাদি নিম্নবর্গের আখ্যান। বর্তমানে নিম্নবর্গীয়রা নোংরা রাজনীতির শিকার।

পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থান কোথায় দাঁড়িয়ে আছে তা একটা আলোচনার মাধ্যমে নির্ণয় করব। পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার ৭২ শতাংশ মানুষ গ্রামে বাস করে। এই বিপুল সংখ্যক গ্রামে বসবাসকারী মানুষ নানা জাত-পাত-কূল-শ্রেণিতে বিভক্ত। গ্রাম্য সাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থানের পরিমাপ করা হত দরিদ্র-ধনী, বা জমির মালিক ও কৃষক, ক্ষেতমজুর, মহাজন-গরীব চাষী ইত্যাদির নিরিখে। কিন্তু এখন শ্রেণিবর্গে বিভাজন প্রক্রিয়া কিছুটা সেকেলে ও পুরনো মনে হচ্ছে। ক্ষমতা, সামর্থ্য, সক্রিয়তা প্রভৃতি গুণধর্মের বিচারে জনসমাজকে শাসক বা প্রভূস্থানীয় ও প্রান্তিক গোষ্ঠীকে বিভাজনের এক নতুন সমাজবিজ্ঞান চর্চা শুরু হয়েছে। প্রান্তিক গোষ্ঠী বলতে মূলত তাদেরকেই বোঝানো হচ্ছে যারা সমাজে ক্ষমতার সমবন্টনের ক্ষেত্রে বঞ্চিত হচ্ছে। এছাড়া বিশেষ কোনো গোষ্ঠীর দ্বারা অধীনস্ত হয়ে, অসাম্য ছাড়াও এই সম্পর্কের মধ্যে আছে সাংস্কৃতিক পার্থক্য যা আবার

উঁচু-নীচু স্তর ভেদকে সূচিত করে। হিন্দু ধর্মাবলম্বী মতাদর্শ অনুযায়ী জাতি ভেদ প্রথায় অনুশাসনের ফলে এক প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে। স্বাধীন ভারতের সংবিধান এই জনগোষ্ঠীকে তফশিলী জাতি হিসাব চিহ্নিত করেছে। ভারতবর্ষে প্রত্যেক সপ্তম ভারতীয় নাগরিক হচ্ছে তফশিলী জাতিভুক্ত, অস্পৃশ্য, হরিজন, কিংবা দলিত। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৩ শতাংশ হচ্ছে দলিত। সংবিধান অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে ৫৯টি দলিত সম্প্রদায় রয়েছে। 'দলিত' এই শব্দটির মধ্যেই পিছিয়ে পড়া প্রান্তিকীকরণের অন্ধকার ইতিহাস লুকায়িত আছে। অস্পৃশ্যতা বিরোধী নানা ধরনের সংস্কারমূলক আন্দোলন, রাজনৈতিক মতানৈক্য, সাংবিধানিক প্রতিবিধান ও আইনি বন্দোবস্ত সত্ত্বেও দলিতায়নের প্রক্রিয়া অব্যাহত। আরেকটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠী হল ভারতের অনার্য আদিবাসি সমাজ, যারা ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যার ৮ শতাংশ। পশ্চিমবাংলায় ৩৮টি তফশিলী আদিবাসী গোষ্ঠী বিদ্যমান, যারা এখানকার মোট জনসংখ্যার ৫.৫০ শতাংশ। পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চলে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সিংহভাগই কৃষি শ্রমিক কিংবা পরিযায়ী শ্রমিক। তফশিলী জাতি ও আদিবাসী নিয়ে প্রায় ২৮ শতাংশ প্রান্তিক বাঙালি আর আছে প্রায় ২৭ শতাংশ মুসলিম, দলিত মুসলিম, অনুন্নত মুসলিম। সব মিলিয় প্রায় ৫৫ শতাংশ তফশিলী জাতি-আদিবাসী-দলিত মুসলিম এবং এদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ গ্রামে বাস করে। এরা কৃষি কিংবা কৃষিনির্ভর উপজীবিকা সম্বল করে স্বল্প আয়ে দারিদ্রসীমার আশেপাশে অবস্থান করে দিন গুজরান করে। সংখ্যায় তারাই বেশি। এরা যেদিন একত্রিত হবে সেদিন ভারতবর্ষের নবপ্রজন্ম হবে। উচ্চবর্গ, শাসক, প্রভূত্ব অধিকারী, ক্ষমতাশালী, ধনশালী এদের আর প্রতাপ প্রতিপত্তি থাকবে না।

পশ্চিম বাংলায় তিন দশকের বাম শাসনে তফশিলী জাতির মহিলাদের সাক্ষরতার হার বেড়েছে তিনগুন। আর আদিবাসী মহিলাদের ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধির হার পাঁচগুন। শিক্ষিতের হার যেমন বেড়েছে পাশাপাশি মনে রাখতে

হবে নিরক্ষরের হারও কম নয়। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অপর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট হচ্ছে তাদের চরম দারিদ্রতা ও অর্থনৈতিক শোচনীয়তা। এই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষেরা বছরে ৬ মাস কাজ পায় ফলে দারিদ্রতা তাদের ক্রনিক ব্যধির মতো পিছু টানে নিয়ে যায়। আর্থিক স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় না। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই বিপুল কর্মহীনতা এবং পাশাপাশি তাদের ভূমিহীনতা এদের প্রবলতর দারিদ্রসীমার নীচে ঠেলে দিচ্ছে। এবং এদের কিছু সংখ্যক লোকজন অনাহারে অর্ধাহারে জীবনপাত করতে বাধ্য হচ্ছে। পশ্চিম বাংলার গ্রাম-গঞ্জে গরীব এবং অতিগরীব মানুষের অনুপাত ২০ শতাংশ, যাদের একটা বড় অংশই আবার অনগ্রসর সম্প্রদায় ভুক্ত। এদের দারিদ্রমোচনের একটা অন্যতম পথ হল ভূমি সংস্কার যার মাধ্যমে ভূমিহীনদের জন্য নূন্যতম জমির অধিকার সুনিশ্চিত করা যায়। দ্বিতীয় পথ হল নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কর্মসংস্থান যার দ্বারা এরা কর্মহীনতায় না ভুগে। পশ্চিমবাংলায় আশি ও নব্বইয়ের দশকে বর্গা নথিভুক্ত এবং খাস জমি বিলিবন্টনের মাধ্যমে প্রায় ৪২ লক্ষ পরিবারের নূন্যতম অর্থনৈতিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা সম্ভবপর হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের মোট গ্রাম প্রায় ৩৮,০০০। তার মধ্যে ৪৬১৬টি গ্রাম অতি দরিদ্র রূপে চিহ্নিত হয়েছে। রাজ্য সরকারের তথ্য অনুযায়ী এই অতি দরিদ্র গ্রামগুলির বেশির ভাগই হচ্ছে তফশিলী জাতি ও আদিবাসী অধ্যুষিত।

বিশিষ্ট আইনবিদ সন্দানশিব একবার রসিকতা করে বলেছিলেন যে—১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের সুবাদে হিন্দুরা পেল ভারত, মুসলিমরা পেল পাকিস্তান, আর তফশিলী জাতি ও আদিবাসীরা পেল সংরক্ষণ। দেশে সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় এই নীতি প্রবর্তন করেই ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রের আধিপত্য কায়েম রাখার সুব্যবস্থা করেছিলেন। কায়েমী স্বার্থের সেই অভিশাপ আজ আমরা সচক্ষে অবলোকন করছি। তারপর ১৯৫৫ সালে অস্পৃশ্যতাজনিত শাস্তি বিধানের আইন সংসদে পাশ করা হল এবং ১৯৭৬ সালে সেই আইন সংশাধন করে নাগরিক অধিকার সুরক্ষা আইন চালু করা হয় দেশজুড়ে। কিন্তু

দলিতায়ন বেড়েই চলল। প্রান্তিকীকরণের চর্চা আর শ্রেণি সমাজের মধ্যে নিবিড় অথচ জটিল বহুমাত্রিক আন্তঃসম্পর্ক রয়েছে। মার্কসীয় কিংবা উত্তর আধুনিক এই দুই বিপরীত ধর্মী দ্বিবাচনিকতা এড়িয়ে যাওয়ায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দুর্ভোগ বাড়ছে।

নিম্নবর্গ ও প্রতাপ ঃ সুদীর্ঘকাল ধরে এই প্রান্তিকীকরণের, নিম্নবর্গের ইতিহাস কি একতরফা ছিল? অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্গ, প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে রাজন্যগোষ্ঠী সমূহের সহযোগিতা নিয়ে শুধুই কি প্রতিরোধ বিহীন ভাবে বৃহৎ সংখ্যক জনগণকে সমস্ত রকমের আর্থিক, সামাজিক, মানবিক, ধর্মীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল? দ্বান্দ্বিক বিশ্ববীক্ষা অনুযায়ী কোনো সামাজিক প্রক্রিয়াই দ্বন্দ্বহীন নয়। শাসনের অত্যাচার মুখবুঝে সহ্য করবে, প্রতিবাদের ছায়া কোথাও পড়বে না, এমন হতে পারে না। নিঃসন্দেহে এই দীর্ঘকালীন প্রত্যাখ্যান প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ ছিল। কিন্তু প্রতিবেদনের জগতে এই প্রান্তবাসীদের স্বর তুলে ধরার মতো কোনো ধারা ভাষ্যকার ছিল না। বর্তমানে আমরা যে চিন্তার উপরে দাঁড়িয়ে স্থির দৃষ্টিতে গবেষণা করতে চাই তা হল নিম্নবর্গীয়দের স্বরকে উর্দ্ধে তুলে ধরা। সামাজিক ইতিহাস আলোচনায় এই স্বর দাগ কাটবে। কোনো একজন পণ্ডিত মন্তব্য করেছিলেন—

> *"যতই জন্মান্তরবাদ ও কর্মবাদ সরবে প্রচারিত হোক না কেন; এদেশের মানুষ তার দুঃখ দারিদ্রকে নিস্প্রতিবাদে মেনে নিয়েছে, একথা বিশ্বাস করা যায় না। প্রাচীন ভারতবর্ষের এ ধরণের প্রতিবাদের তথ্য বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। তার একটা কারণ এই যে, যে সাহিত্য আমাদের হাতে এসে পৌঁচেছে তা ক্ষমতাই আসীন শ্রেণিই রক্ষা করেছে যা তাদের স্বার্থের অনুকূল। কিন্তু মনে হয়, ঐতিহাসিক অনুবীক্ষণ দৃষ্টি নিয়ে লক্ষ্য করলে*

হয়তো প্রতিবাদের ইতিহাস কিছু কিছু চোখ পড়বে
মনে হয় এ সন্ধানের প্রয়োজন আছে।'' [১৩]

শ্রেণি-বৈষম্যের কথা ভেবে গ্রামসি সাব-অলটার্ন শব্দটিকে গ্রহণ করছিলেন মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। উচ্চবর্গের ক্ষমতাশালী বিত্তরা সবসময় চায় সাব-অলটার্ন বা নিম্নবর্গের উপর নিজর প্রভাব ও আধিপত্য কায়েম রাখতে। ভারতবর্ষে প্রাক্-ঔপনিবেশিক যুগে ধর্ম ছিল সমাজের চালক। তখন ধর্ম বর্ণ বিভাজন অনুসারে জাতি নিয়ন্ত্রিত সমাজে পুরোহিতেরা নিম্নবর্গীয় রূপে পরিচিত হতেন। কিন্তু ষোড়শ শতকে সেই ধ্যান-ধারনাকে ভেঙে খান খান করে দিয়েছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব। শ্রীচৈতন্যদেবের উদার মানসিকতায় প্রমাণিত ও প্রসারিত হতে থাকে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-ধনী-দরিদ্র-উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে— 'সবার উপর মানুষ সত্য' এই বাণী। ঔপনিবেশিক যুগে ইংরেজ শাসক ব্যতিত আর অন্য সকল ভারতবাসীই নিম্নবর্গ। অর্থাৎ সেখানে নিম্নবর্গের ধারণা বিবর্তিত হয় শাসকের অবস্থান ভেদে। উত্তর-ঔপনিবেশিক যুগে অর্থনৈতিক অবস্থান ভেদে নিম্নবর্গের নতুন আরেকটি প্রতি ধারণা রূপলাভ করে তা হল—অর্থশালী ও বিত্তশালী ব্যাক্তি সে যদিও অসামাজিক, সুদখোর, অন্যায়কারী হোক না কেন সেই উচ্চবর্গ। অর্থাৎ বাস্তবিক সমাজে যারা আর্থিক দিক দিয়ে প্রতিষ্ঠিত তাদের শিক্ষা-দীক্ষা-রুচিবোধ- মানবিকতাবোধ না থাকলেও তারা উচ্চবর্গ। ফলে উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের ধ্যান-ধারণা, তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি ও নন্দনতত্ত্বের নান্দনিক বিশ্বে ক্রম বিবর্তিত হচ্ছে। তবু আমাদের দৃষ্টি সেই নিম্নবর্গ প্রান্তিক মানুষের দিকে —করালী, ঢোঁড়াই, কাশেম, কুবের, গফুর, লখিন্দর, বিরসা, বিলাস, খিজির, বাখারু, দনু-পিতেম-জামির-লুবিনী- শারিবা-আস্তিকমাল-পরশুরাম- মাল- বালা লখিন্দর- রাজেশ্বরী- সাগর- যোগী- যোগান-গেপাল- প্রত্যেকের দিকে। অন্ত্যজ-অন্তেবাসী নিম্নবর্গ মানুষ। একদিন বিশ্ব বিবর্তিত হবে। সভ্যতা সংস্কৃতির উপর আধিপত্য কায়েম করবে নিম্নবর্গরা। যেখানে কৌমসমাজের ক্ষমতা ও আধিপত্যে নগরজীবন তার প্রশ্বাস নেবে। এ

প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তিটি যথার্থ ও প্রণিধানযোগ্য—

> *"দেশের মঙ্গল? দেশের মঙ্গল, কাহার মঙ্গল? তোমার আমার মঙ্গল দেখিতেছি, কিন্তু তুমি আমি কি দেশ? তুমি, আমি দেশের কয়জন? আর এই কৃষিজীবি কয়জন? তাহাদের ত্যাগ করিলে দেশে কয়জন থাকে। হিসাব করিলে তাহারাই দেশ-দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। তোমা হইতে, আমা হইতে কোন কার্য হইতে পারে? কিন্তু সকল কৃষিজীবী ক্ষেপিলে কে কোথায় থাকিবে? কি না হইবে?"* [১৪]

প্রাচীন ভারতে প্রতিবেদনের জগতে, কিছু সংকেত অবশ্যই পাওয়া যাচ্ছে, যেখান থেকে বিনিময়ের কাজটা শুরু করা যেতে পারে। প্রথমত পণ্ডিতদের বয়ান অনুযায়ী, আদিতে বৈশ্য ও শূদ্ররা ছিলেন দুটি পৃথক বর্ণ। বৈশ্য বর্ণের লোকেরা ছিলেন মূলত কৃষিজীবী। 'শূদ্র' যারা তারা করতেন গৃহভৃত্যের কাজ; আর বিভিন্ন ধরনের বৃত্তিমূলক কাজ। 'সব-অলটার্ন স্টাডিজ গোষ্ঠী' অন্তেবাসী কৃষক শ্রমজীবীদের—জমায়েত বিদ্রোহ, ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকাণ্ডের ইতিহাস যেমন বিশ্লেষণ করেছেন, তেমনি চিনে নিতে চেয়েছেন সভ্যতার 'অপর বর্গ' হিসাবে নিম্নবর্গের নির্মাণ প্রক্রিয়াকে। একই সঙ্গে নিম্নবর্গ চেতনার আনুগত্য, প্রত্যাখানে যুগলব্ধ স্বরূপকে খুঁজেছেন ভারতীয় ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বের ধর্মসংঘাত, মিথ, কিংবদন্তির লোকায়ত উপাদানগুলির বিচার বিশ্লেষণের সাহায্যে। আমাদের বিচার বিশ্লেষণের ক্ষেত্র সাহিত্য। এখানে আমরা বুঝতে চাইব নিম্নবর্গের রিপ্রেজেন্টেশনের বৈশিষ্টকে। রিপ্রেজেন্ট যিনি করেন ঐতিহাসিক ভাবেই তিনি মধ্যবিত্ত ও মধ্যচিত্ত। এখন দেখার বিষয় এটাই যে, যিনি রিপ্রেজেন্ট করছেন, তিনি নিম্নবর্গ চেতনার প্রতি আনুগত্য ও

দ্রোহচেতনাকে কতখানি চিনে নিতে পেরেছেন? এই প্রশ্ন জরুরী। উপনিবেশোত্তর নিম্নবর্গ চেতনাবাদ আমাদের অন্তর্ঘাতের, আমাদের বিনির্মানের, আমাদের অধ্যয়নের এবং বিশ্লেষণের কৃৎকৌশল। বর্তমান অধ্যায়ে আমাদের বিশ্লেষণী দৃষ্টিকোণকে সেভাবেই এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইব।

সাব-অলটার্ন ইতিহাসবিদদের মতে অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ ইতিহাস ধারায় ভারতবর্ষের উচ্চবর্গীয় ইতিহাস প্রকল্পে নিম্নবর্গ তাদের স্বাতন্ত্র্য নিয়ে উপস্থাপিত হয়নি। এ জন্য তারা উচ্চবর্গের ইতিহাস পরিকল্পের বাইরে ক্ষমতাও প্রতিপত্তির মাপকাঠিতে নিম্নবর্গকে মূল্যায়ন করেছেন। শারীরিক অর্থে নিযুক্ত সামাজিক মর্যাদায় অনগ্রসর, ক্ষমতাহীন, অবহেলিত, বঞ্চিত, শোষিত এবং আর্থিক বিচারে নিম্নস্তরের কৃষক-শ্রমিক ও অন্ত্যজ প্রান্তিকই নিম্নবর্গ। আনতোনিত্ত গ্রামসির সাব-অলটার্ন সম্পর্কিত মতামত অনুসরণ করে ইতিহাসবিদরা নিম্নবর্গের জীবনযাত্রা, আচার-আচরণ, ভাবাদর্শ অনুসন্ধান করে তাদের ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কৃতির স্বরূপ তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছেন। নিম্নবর্গ মানুষের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতার সম্যক ধারণা বাংলা উপন্যাসে পাওয়া যায়। মূলত বাংলাভাষী ভূ-খণ্ডের আর্থ-সামাজিক সংস্থান, উৎপাদন কাঠামো, শ্রেণিবিন্যাস ও সমাজ বিবর্তনের ক্রমধারায় উপন্যাস বিষয় বৈচিত্র ও চরিত্র চিত্রণে নিম্নবর্গের প্রাধান্য সুস্পষ্ট। নিম্নবর্গের বহুমাত্রিক আচরণ, জীবন বাস্তবতা, কৌম সংস্কৃতির সারবত্তা, উপস্থাপিত হয়েছে ঔপন্যাসিকদের অনেক আখ্যানে। উপন্যাসের যাত্রালগ্নে সাধারণ মানব মানবীর জীবন অবলোকন সূত্রে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিম্নবর্গের মানুষের জীবন উন্মোচিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে নতুন আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কথা সাহিত্যিকরা 'কল্লোল' (১৯২৩) পত্রিকা কেন্দ্রিক উপন্যাসচর্চায় নিম্নবর্গের জীবন উপন্যাস্তে সচেতন হয়েছিলেন।

নিম্নবর্গের ইতিহাসের অপর আলোচ্য বিষয় হল ঐতিহাসিক উত্তরনের

সমস্যা। এর অন্তত দুটি দিক আছে। একটি হল উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গের রাজনৈতিক সংগ্রামের ফলস্বরূপ সমাজ কাঠামোর মৌলিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা কতদূর? অন্যটি হল, নিম্নবর্গের চেতনার পৃথক ও স্বতন্ত্র রূপটিতে পরিবর্তনের সম্ভাবনা আছে কী? পরিবর্তন ঘটলেও তা কীভাবে ঘটে? প্রথম প্রশ্নটা বলা বাহুল্য কোনো সরল কিংবা সাধারণভাবে প্রযোজ্য উত্তর নেই। কারণ এই সম্ভাবনাগুলো একান্তই নির্ভর করে বিশেষ ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বের অসম বিকাশের ফলে সৃষ্ট বিরোধগুলির ক্ষেত্রে বিভিন্ন শ্রেণি, গোষ্ঠী বা জনসমষ্টির রাজনৈতিক ভূমিকা ও পারস্পরিক শক্তির উপর। উত্তরণ প্রক্রিয়ার কোনো সাধারণ নিয়ম এখনও পর্যন্ত আবিস্কার করা যায় নি। তবে উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গ বিশ্লেষণ পদ্ধতি যারা অনুসরণ করেন, তাঁদের বিশ্বাস উত্তরণ প্রক্রিয়ার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত শ্রেণি-সংগ্রামের রাজনৈতিক প্রকাশ ও শ্রেণিচেতনার বৈপরীত্য গভীরভাবে অনুসন্ধান করলে এই সাধারণ নিয়মগুলি নির্ধারণ করা অপেক্ষাকৃত সহজ হবে। বিশেষ করে শ্রেণি সম্পর্কের জটিল বিন্যাস এবং সমাজ কাঠামোর বিভিন্ন স্তরেও ভৌগলিক ব্যপ্তিতে শ্রেণিদ্বন্দ্বের অসম বিকাশকে আরো স্পষ্টভাবে বোধগম্য করে তোলা যাবে। দ্বিতীয় প্রশ্নটিও সমস্যা জর্জরিত। উচ্চবর্গের চেতনার স্বরূপ ও তার নিজস্ব বিবর্তনের ধারা ঐতিহাসিকদের কাছে অনেকবেশি সহজবোধ্য। নিম্নবর্গের চেতনার সন্ধান জানা যায় নানা জটিল বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে। এই মুহূর্তে এই বিশ্লেষণ পদ্ধতিগুলি যে অভিনব ও অপেক্ষাকৃত অনির্দিষ্ট, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। বিশেষ দেশকালের সীমার মধ্যে এই বিশ্লেষণ নিম্নবর্গের চেতনার স্বরূপ উদঘাটন করতে সাহায্য করেছে কী না, তা বিচার করার একমাত্র মানদণ্ড হল সমাজ পরিবর্তনের বৈপ্লবিক রাজনীতির মানদন্ড। পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রক্রিয়া ও রাষ্ট্রের অধীন যে আধুনিক সমাজ ব্যবস্থা, তার ঐতিহাসিক উত্তরনের ক্ষেত্রে কৃষক চেতনার একক, এমনকি প্রধান ভূমিকাও থাকা সম্ভব নয়।

উনিশ শতকের নবজাগরণের পরশমনির স্পর্শে সামাজিক অর্থনৈতিক

ধর্মীয় ভেদাভেদের পরিবর্তন হয়। ক্ষমতাশালী রূপে এতদিন যাঁরা সমাজের মূল স্রোতের মধ্যে ছিলেন তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন জাতির জাগরণ না হলে কখনও ব্যক্তির জাগরণে লাভ নেই। অর্থাৎ একক ব্যক্তির জাগরণে বহুর উপকার সম্ভব নয়। সমগ্র জাতির জাগ্রত হতে হবে নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য। কেননা, উপনিবেশবাদের কবলে পড়ে একক এবং বহু উভয়েই। বহিরাগত ধনবাদী সভ্যতার প্রতিভূ ইংরেজরা ভারত ভূখণ্ডকে উপনিবেশ হিসেবেই শুধু গ্রহণ করেছিলেন। বাংলার সাংস্কৃতিক বিশ্ব ইংরেজ আধিপত্যে নিজেদের স্বকীয়তা ভাসিয়ে দিয়েছিল। ক্যাপিটালিজমের সর্বগ্রাসী প্রসারে উনিশ শতকের বাঙালিরা তখন আরও সীমায়িত ভূগোলের জনান্তিকে পরিণত হয়েছিল। ভূমিজীবী, শ্রমজীবী, এমনকি সম্ভ্রান্ত সংস্কৃতির অধিকারী সামন্তপ্রভূ, জমিদার, ভূস্বামী, প্রত্যেকেই ইংরেজ ঔপনিবেশিক এর অধীনস্ত সাব-অলটার্ন। শোষকের চোখে ছোট বড় সবাই তখন অধীনস্ত, উদ্বাস্তুর মতো অসহায়।

'রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত' প্রবন্ধে—

> *"চিরদিন ভারতবর্ষে ও চীনদেশে সমাজতন্ত্রই প্রবল, রাষ্ট্রতন্ত্র তার নীচে। দেশ যথার্থভাবে আত্মরক্ষা করে এসেছে সমাজের সম্মিলিত শক্তিতে। সমাজই বিদ্যার ব্যবস্থা করেছে, তৃষ্ণিতকে জল দিয়েছে, ক্ষুধিতকে অন্ন, পূজার্থীকে মন্দির, অপরাধীকে দণ্ড, শ্রদ্ধেয়কে শ্রদ্ধা—গ্রামে গ্রামে দেশের চরিত্রকে রক্ষিত এবং তার শ্রীকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। দেশের উপর দিয়ে রাজ্য সাম্রাজ্যের পরিবর্তন হয়ে গেল, স্বদেশী রাজার নিয়তই রাজত্ব নিয়ে হাত ফেরাফেরি চলল, বিদেশী রাজারা এসে সিংহাসন কাড়াকাড়ি করত লাগলো, লুটপাট অত্যাচারও কম হল না,*

কিন্তু তবু দেশের আত্মরক্ষা হয়েছে যেহেতু সে আপন কাজ আপনি করেছে তার অন্নবস্ত্র ধর্মকর্ম সমস্তই তার আপনারই হাতে। এমনি করে দেশ ছিল দেশের লোকের, রাজা ছিল তার এক অংশ মাত্র; মাথার ওপর যেন মুকুট থাকে তেমনি। রাষ্ট্রপ্রধান দেশে রাষ্ট্রতন্ত্রের মধ্যেই বিশেষভাবে বদ্ধ থাকে দেশের মর্মস্থান, সমাজপ্রধান দেশে দেশের প্রাণ সর্বত্র ব্যপ্ত হয়ে থাকে. রাষ্ট্রপ্রধান দেশে রাষ্ট্রতন্ত্রের পতনে দেশের অধঃপতন, তাতেই সে মরে যায়। গ্রীস রোম এমনি করেই মারা গিয়েছে। কিন্তু চীন ভারত রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের ভিতর দিয়েই সুদীর্ঘকাল আত্মরক্ষা করেছে, তার কারণ সর্বব্যাপী সমাজে তার আত্মা সমাজে প্রসারিত।

পাশ্চাত্য রাজার শাসনে এইখানে ভারতবর্ষ আঘাত পেয়েছে। গ্রামে গ্রামে তার যে সামাজিক স্বরাজ পরিব্যাপ্ত ছিল, রাজশাসন তাকে অধিকার করলে। যখন থেকে এই অধিকার পাকা হয়ে উঠল তখন থেকে গ্রামে গ্রামে দিঘিতে গেল জল শুকিয়ে, জীর্ণ মন্দিরে শূন্য অতিথিশালায় উঠল অশথ গাছ, জাল জালিয়াতি, মিথ্যা মোকাদ্দমাকে বাধা দেবার কিছু রইল না, রোগে তাপে দৈন্যে অজ্ঞানে অধর্মে সমস্ত দেশ রসাতলে তলিয়ে গেল।'' [১৫]

এই দুটি অনুচ্ছেদের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। উনবিংশ শতাব্দির প্রায়

শেষ থেকে ভারতের মুক্তি সম্পর্কে, রাজা-রাজ্য-রাজনীতি সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত বিশিষ্ট চিন্তা রবীন্দ্রনাথ অবিচ্ছিন্ন ধারায় পরিবেশন করেছেন। সে আলোচনায় পরিসর পরাধীনতা, শাসন, নিম্নবর্গ, প্রতিবাদহীন সমাজব্যবস্থা, নিম্নবর্গীয়দের আখ্যান ইতিহাস তথা প্রেক্ষিত সবই সুবিস্তৃত। ক্রমবদ্ধ আলোচনায় সে মনোভাবের পূর্ণ প্রতিমাটি আমরা অবশ্যই লাভ করতে পারি। যেমন সমাজতন্ত্র বলতে রবীন্দ্রনাথ কী বুঝেছেন! আধুনিক অর্থে বৃহৎ শ্রেণিশাসন নয়। সমাজতন্ত্র বলতে সমাজশাসন। এ সমাজ রাষ্ট্রশক্তির প্রভাব নিরপেক্ষভাবে সমৃদ্ধ হওয়া এক অস্তিত্ব।

বুর্জোয়া চেতনার সমগ্রতা তার ঐতিহাসিক নিশ্চয়তা, ক্ষমতা ব্যবহারের নানা জটিল প্রক্রিয়ার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে এমন কোনোও শ্রেণি চেতনার নেতৃত্বে বৈপ্লবিক রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা ছাড়া কৃষক শ্রেণির ঐতিহাসিক পরাধীনতার অবসান সম্ভব নয়। মার্কসবাদের আদিযুগ থেকেই এই সত্য সর্বজন স্বীকৃত। কিন্তু পুঁজিবাদী উৎপাদনের বিশ্বব্যাপী প্রসারের পরেও যে বহুদেশে এক বিশাল কৃষকশ্রেণি তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব দীর্ঘদিন বজায় রেখে চলবে, এমন সম্ভাবনার কথা উনিশ শতকের ইউরোপীয় মার্কসবাদীরা ভাবেন নি। তখন মনে করা হত কৃষক শ্রেণির অবলুপ্তি পুঁজিবাদি উৎপাদনের অবশ্যম্ভাবি পরিণতি নির্মম,রক্তক্ষয়ী কিন্তু অনিবার্য। অথচ ১৯১৭ এর রুশ বিপ্লব থেকেই দেখা গেছে তথাকথিত অনুন্নত ঐতিহাসিক উত্তরণ সম্ভব হয়েছে ব্যাপক কৃষক জনসমষ্টির প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে। এক বৃহত্তর সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণির অঙ্গীভূত হয়ে নয়, তাদের জীবিকা, জীবনধারণও চেতনার আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে শ্রমিক শ্রেণির সঙ্গে বৈপ্লবিক ঐক্যের মধ্য দিয়ে। সুতরাং ভারতবর্ষের মতো কৃষিজীবীবহুল দেশে কৃষকচেতনার পরিবর্তনের সমস্যা কোনো ঐতিহাসিক অনিবার্যতার ধারণা দিয়ে সমাধান করা যাবে না। আধুনিক পুঁজিবাদের ক্ষমতার বিরুদ্ধে লড়তে সক্ষম এমন শ্রেণিচেতনার সঙ্গে বৈপ্লবিক ঐক্যের সম্ভাবনার মধ্যেই এর সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে। এজন্য আনতোনিও

গ্রামসি বলেছিলেন সাব-অলটার্ন শ্রেণির জীবন যাত্রার আচার-আচরণ, ভাবাদর্শ গভীরভাবে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

আজকের ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও সেই কারণে বৈপ্লবিক নেতৃত্ব তথা বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে উচ্চবর্গ নিম্নবর্গ দ্বন্দ্বের বিন্যাস ও অসমতা। বিভিন্ন গোষ্ঠী ও অঞ্চলে সেই দ্বন্দ্বের নানা ধরণের বহিঃপ্রকাশ এবং এই অসমতার মধ্যে বৈপ্লবিক ঐক্যের সন্ধান করা। সাম্রাজ্যবাদী আর জাতীয়তাবাদী ইতিহাসের বিরোধীতার পথ ধরেই নিম্নবর্গের ইতিহাসের প্রথম কর্মসূচি নির্দিষ্ট হল। দুটি বিষয় এখনে প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছিল। এক— ঔপনিবেশিক আর দেশীয় দু-ধরনের উচ্চবর্গের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আর পদ্ধতির সঙ্গে নিম্নবর্গের রাজনৈতিক পার্থক্য। দুই— নিম্নবর্গীয় চেতনার নিজস্বতা। প্রথম বিষয়টি অনুসরণ করতে গিয়ে 'সাব-অলটার্ন স্টাডিজ'-এর ঐতিহাসিকেরা দেখলেন যে শুধুমাত্র দেশীয় উচ্চবর্গের আঙ্গুলি হেলনে নিম্নবর্গের দল জাতীয়তাবাদী নেতাদের এই অভিযোগ যেমন সত্য নয়, তেমনি জাতীয়তাবাদী চেতনা জেগে উঠল, এই দাবিও সত্য নয়। উচ্চবর্গ পরিচালিত জাতয়ীতবাদী রাজনীতির মঞ্চে নিম্নবর্গ সত্ত্বেও তারা সেখানে প্রবেশ করতে আদৌ রাজি হয় নি, অথবা একবার প্রবেশ করে পরে সরে এসেছিল। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য, পরিকল্পনা, পদ্ধতি ছিল উচ্চবর্গের তুলনায় পৃথক। অর্থাৎ জাতীয়তাবাদী রাজনীতির ক্ষেত্রেও নিম্নবর্গের জাতীয়তাবাদ ছিল উচ্চবর্গের জাতীয়তাবাদের তুলনায় ভিন্ন।

নব্য উপনিবেশ জাতি (ঙ্খথন্স্ঠ), শ্রেণি (ঙ্খস্তুন্স্), লিঙ্গ (ঝত্র—ত্মত্রন্), ধর্ম (উত্রুদ্ধ—), সামজিক অবস্থান ((ঙ্কথন্ঠস্ত্র) অনুসারে নিম্নবর্গের নতুন নতুন চেহারা আত্মপ্রকাশ করেছে। অনগ্রসর মানুষের জীবন এখন অনেকটা বহু ব্যবহৃত পথ ঘাটের মতো। বিত্তভোগী ক্ষমতাশালী মানুষেরা দেহে শুধু খাটায় না, দেহ দানেও বাধ্য করে। তাই 'সাব-অলটার্ন' শুধুমাত্র শোষিত অর্থে গৃহিত হতে

পারে না এমনকি সমাজে যারা তফশিলী জাতি বা উপজাতির মানুষ তারাও সাব-অলটার্ন নন। তাহলে সাব-অলটার্ন হলো সেই মানুষেরা যারা অন্যের দ্বারা কোনো না কোনোভাবে পীড়িত, শোষিত, প্রতারিত হচ্ছে। সেখানে শ্রেণিবৈষম্য, অর্থবৈষম্য, বর্ণবৈষম্য থাকতে পারে। তবে এরা যে বঞ্চিত হয় এবং এরা যে প্রগতির কোনো অর্থ বোঝে না, বিজ্ঞান-বুদ্ধির ধার ধারে না, এমনকি দেশের সম্পর্কেও কোনো খবর রাখে না—এ বিষয়ে কোনো সংশয় নেই।

নিম্নবর্গের বিশুদ্ধ পাঠ আলোচনায় আমরা উচ্চবর্গের রাজনীতি ও ভাবাদর্শের মধ্যে নিম্নবর্গের অবস্থানটা জানতে পেরেছি। নিম্নবর্গের ইতিহাসবিদেরা সাম্প্রতিক তিনটি জ্বলন্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন, তা হলো— (ক) সাম্প্রদায়িকতা (খ) জাতিভেদপ্রথা (গ) নারীর সামাজিক অবস্থান। বর্তমান সাহিত্য, সমাজতত্ত্বে এই বিষয়গুলি মূল আলোচ্য বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাহিত্যে নিম্নবর্গের কথা উচ্চবর্গের সাহিত্যিকরা অনেক আগেই তুলে ধরেছেন, যা আগামী দিনে নিম্নবর্গের ইতিহাস রচনায় সাহায্য করতে পারে।

প্রথম পর্বের 'সাব-অলটার্ন স্টাডিজ' এর গবেষণার একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাস। রণজিৎ গুহর 'এলিমেন্টারি আসপেক্টস' গ্রন্থে বিদ্রোহের কথা উল্লেখ আছে। এ ছাড়াও 'সাব-অলটার্ন স্টাডিজ' সংকলনে এবং তার বাইরে অন্যান্য নানা প্রবন্ধে নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকেরা কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাস অনুসন্ধান করে বিদ্রোহী কৃষক চেতনার পরিচয় দেবার চেষ্টা করলেন। এই চেষ্টার ফলে অল্প কিছু নতুন আবিষ্কার হল। বিদ্রোহী কৃষক যেখানে তার নিজের কথা বলে গেছে। কিন্তু জানাই ছিল এমন সূত্র খুব বেশি পাওয়া যাবে না। ইতিহাস রচনার প্রকরণ হিসাবে অনেকে বেশি ফলপ্রসু হয়ে দেখা দিল কৃষক বিদ্রোহের পরিচিত নথিপত্র গুলোতেই নতুন ভাবে পড়ার কৌশল।

শাসক বর্গের প্রতিনিধিরা যেখানে কৃষক বিদ্রোহের রিপোর্ট দিচ্ছে রাষ্ট্রশক্তি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সেই সরকারি রিপোর্টের বর্ণনাকেই বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উল্টো করে পড়লে বিদ্রোহী কৃষক চেতনার পরিচয় পাওয়া যায় নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকেরা এর অনেক উদাহরণ এনে হাজির করলেন। তাঁরা আরো দেখলেন উচ্চবর্গের ঐতিহাসিকেরা এমনকি প্রগতিশীল এবং শোষিত শ্রেণির প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ঐতিহাসিকেরাও যখন তাদের যুক্তিবাদী ধ্যান-ধারণার বশবর্তী হয়ে কৃষকচেতনার উপস্থিত ধর্মবিশ্বাস, অলৌকিকতা, মিথ, দৈবশক্তিতে আস্থা, অলীক কল্পনা, প্রকৃতিকে অযৌক্তিক মনে করে উপেক্ষা করেন বা সে সবের যুক্তি সম্মত ব্যাখ্যা খাড়া করে একরকম মিথ্যার ভেতর থেকে সঠিক ইতিহাসটুকু বের করে আনার চেষ্টা করেন। এখন তারা কৃষকচেতনার বিশিষ্ট উপাদান গুলোকেই আসলে হারিয়ে ফেলেন। হয়তো নিজেদের অগোচরেই তারা নিম্নবর্গের রাজনীতিকে উচ্চবর্গে— চেতনার ছকে ফেলে বোধগম্য করার চেষ্টা করেন। নিম্নবর্গের নিজস্ব ইতিহাসে নিম্নবর্গের কীর্তির স্বাক্ষর কিন্তু সেখানে হারিয়ে যায়।

সাহিত্যিক প্রকাশ ঃ

বিশশতকের শেষ দিকে ইতিহাসে সাব-অলটার্ন সম্পর্কিত চর্চা শুরু হয়। বিভিন্ন ঐতিহাসিক কালপর্বে সমাজের প্রান্তবাসীদের কথা খুব বেশি গুরুত্ব পায়নি। অনেক কথা, তথ্য অজানাই থেকে যায় লিখিত ইতিহাসের মধ্যে। নব-ইতিহাসবিদেরা অনাবিস্কৃত ইতিহাসের আলোকে নিম্নবর্গকে পুনর্নির্মাণ করতে চান। ফলে অতীত ইতিহাসের অসম্পূর্ণতাকে পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এই ধরনের ইতিহাসবিদের আলোচনা বিশেষ গুরুত্ব রাখে। নিম্নবর্গের মানুষও প্রথাগত ইতিহাস বহির্ভূত রচনায় গুরুত্ব পেতে থাকে। আর তা থেকেই নিম্নবর্গের মানুষের ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্র তৈরি হয়। শুরু হয় নিম্নবর্গীয় সাহিত্য ও তার সাহিত্যিক প্রকাশ। সাহিত্যে নিম্নবর্গ সম্পর্কিত

আলোচনা, চর্চা বহু আগে থেকেই লক্ষ্য করা যায়। মানিক, বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, শরৎচন্দ্র, বঙ্কিম ইত্যাদির রচনায় নিম্নবর্গদের নিয়ে আলোচনা রয়েছে। তবে তাঁদের রচনায় নিম্নবর্গের ব্যাপকতা আপনা আপনি উঠে এসেছে। নিম্নবর্গের কাহিনি রচনা করবেন বলে তাঁরা কলম ধরেন নি। তাঁদের রচনায় নিম্নবর্গের উপস্থিতিকে বলা যায়— ণজ্ঞ্ঠ্রদ্রন্ জ্ঞ্ঠ্ন (খদ্ধত্রণ নিম্নবর্গ এই ধারা ও ধারণাটি বিংশ শতকের আটের দশকে ভারতীয় তথা, বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ করে। তারপর বহু আলোচনার পর এই ব্যাপকতা ও স্বরূপ নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা চলতেই আছে। আমাদের আলোচ্য অভিজিৎ সেনের রচনাও 'নিম্নবর্গ' এই ধারাটিকে কেন্দ্র করে রচিত নয়। একটি সাক্ষাতকারে অভিজিৎ সেন জানিয়েছেন—

> *"আমি যে সমস্ত উপন্যাস ও ছোট গল্প রচনা করেছি, এবং বিশেষ করে যাতে নিম্নবর্গের ইতিবৃত্তান্ত লুকায়িত আছে তা আমার স্বতঃস্ফুর্ত শিল্পভাবনায় রচিত হয়েছে। (ভত্নখ্ঠ্ঠ্রন্ বা নিম্নবর্গ এই ধারাটির সঙ্গে আমার পরিচিতি হয়েছে অনেক পরে। জন্ম-শিক্ষা-দেশভাগ-কর্মজীবনে ইত্যাদি সূত্রে গ্রামবাংলার বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের যেখানে আধুনিক সভ্যতার আলো তখনও পৌঁছায়নি সেখানকার জনজীবনপদ, আচার-আচরন, ধর্ম-রাজনীতি, সমাজব্যবস্থাকে আমি যেমন দেখেছি, তাহাই একজন সাহিত্যিকের মতো তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি।"* [১৬]

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা উপন্যাসগুলিতে নিম্নবর্গের মানুষ প্রাধান্য পেতে থাকে। আধিপত্যহীন ভারতীয় জনগণ, আদিবাসী, মুন্ডা, গ্রামের মানুষ,

নারী, প্রান্তিক জনগণ, ঔপনিবেশিক শিক্ষার আলোক বহির্ভূত ও ধর্মভীরু মানুষদের কথা স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা উপন্যাসগুলিতে বেশি করে ফুটে উঠেছে। 'সাবলটার্ন স্টাডিজ'-এর প্রথম পর্বের কাজের সবচেয়ে মৌলিক সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল 'গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভ্যাক'-এর দুটি প্রবন্ধে। ঔপনিবেশিক ভারতে কৃষক বিদ্রোহ নিয়ে সাব-অলটার্ন স্টাডিজ-এর গবেষণার দুটি বৈশিষ্টের দিকে তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। প্রথম বৈশিষ্ট্য হল যে ঔপনিবেশিক শাসনযন্ত্রের যা পরিধি, নিম্নবর্গের রাজনীতি তার বাইরেও বটে, আবার ভেতরেও বটে। যে অর্থে তার বাইরে, সেই অর্থে নিম্নবর্গের রাজনীতি ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রব্যবস্থা অথবা ভাবাদর্শের তুলনায় স্বতন্ত্র। কিন্তু তা আবার ভেতরেও বটে; কারণ বহু ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, নিম্নবর্গের রাজনীতি ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপখাইয়ে নিচ্ছে, তাকে সুবিধা মতো ব্যবহার করছে, হয়তো বা এরকমভাবে আত্মস্থ করছে। এই গবেষণার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল, একদিকে নিম্নবর্গীয় সত্তা বা চৈতন্যের একটা বিশুদ্ধ আকৃতির ধারণা, অন্যদিকে নিম্নবর্গের উপস্থিতি ঘটছে বিভিন্ন আকারে, বিভিন্ন চেহারায়. এমনকি নিজের ভেতরে বিভাজিত অবস্থায়। গায়ত্রী স্পিভ্যাক প্রশ্ন তুললেন, ইতিহাস রচনার প্রতিটি উপাদানই যখন দেখিয়ে দিচ্ছে নিম্নবর্গের ঐতিহাসিককে অত ঘটা করে বিশুদ্ধ কৃষক চৈতন্য অথবা একান্তভাবে স্বতন্ত্র নিম্নবর্গের রাজনীতির স্লোগান আওড়াতে হচ্ছে কেন? বুর্জোয়া ইতিহাস রচনায় 'মানব' অথবা 'নাগরিক' নামে যে সার্বভৌম কর্তাটি অধিষ্ঠিত হয়েছিল, নিম্নবর্গের ঐতিহাসিক তো দেখিয়েছেন যে, সে কর্তাটির আসল পরিচয় হল সে উচ্চবর্গ। এখন আবার সেই জায়গায় 'নিম্নবর্গকে' আর একটি সার্বভৌম কর্তার পোশাক পরিয়ে ইতিহাসের নায়ক হিসাবে উপস্থিত করার প্রয়োজন কী? আসলে ইতিহাসের কোনো একটি কর্তা আছে এবং তার একটি বিশুদ্ধ পূর্ণাবয়ব চৈতন্য আছে এ ধারনাটিকে তো নিম্নবর্গের ঐতিহাসিক তাঁর গবেষণার মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ করেছেন। সেই ধারনাকেই আবার তারা ফেরত আনার চেষ্টা করছেন

কেন? ঐতিহাসিকের লেখার ভেতর দিয়ে নিম্নবর্গ তার নিজের কথা বলবে, এটাতো নিতান্তই গল্প কথা। খুব বেশি হলে সেটা ঐতিহাসিকের রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রকাশ। আসলে তো তারা ঐতিহাসিক নিম্নবর্গের প্রতিনিধিত্ব করেছেন মাত্র। নিম্নবর্গকে ইতিহাসের পাতায় উপস্থিত করেছেন। নিম্নবর্গ তার নিজের বয়ান কখনই বলতে পারে না।

বাংলা কথাসাহিত্য নিম্নবর্গের জীবন বৈচিত্র রূপায়নে মানিক, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, শরৎ, মহাশ্বেতা দেবী, অভিজিৎ সেন ইত্যাদি কথাসাহিত্যিকের দক্ষতা অপরিসীম। বিংশ শতাব্দীর পরিবর্তনশীল আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের সাহিত্যধর্ম হয়ে উঠেছে নবতর সমাজ-ভাবনার শিল্পমণ্ডিত রূপ। সাব-অলটার্ন ইতিহাসবিদরা যাদের নিম্নবর্গ হিসাবে অভিহিত করেছেন তাদের তাঁরা চিত্রিত করেছন বস্তু অভিজ্ঞতা ও ভাবের সমগ্রতায়। সামাজিকভাবে নিচু বা সাধারণ স্তরের মানুষ অথবা যারা উচ্চবর্গের কাছে অপ্রধান জনগোষ্ঠী, তাদের জীবনের বাস্তবতা, আদিম জৈব প্রবৃত্তি, নর-নারী সম্পর্কে প্রচিলত নীতিশাসন বহির্ভূত আচরন, উচ্চবর্গ কর্তৃক শোষণ, শাসন ও এর প্রতিক্রিয়ায় তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রতিরোধ এবং জীবনাচার, সংস্কার ও জীবনযাপনের রীতিপদ্ধতি নিয়ে যে স্বাতন্ত্রের অধিকারী নিম্নবর্গ তারই সম্যক উন্মোচন লক্ষ্য করা যায় বিভিন্ন উপন্যাসে।

রাহুল সংস্কৃত্যায়ন 'নতুন মানব সমাজ'- বইটি জেলে বসেই লিখেছিলেন। ১৯৩৯ সালে তিনি এটি রচনা করেন হিন্দী ভাষায় 'তুমিহারি ক্ষয়' নামে। এই বইতে রাহুল পরিস্কার ভাষায় প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বহুমাত্রিক শোষণের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। তাঁর নিজের ভাষায়—

> *''তুমাহারি ক্ষয়'-এ আমি আমার মনের কয়েকটি কথা বলিয়াছি। বস্তুত বিষয় আরো কঠোর ভাষা দাবী করে, কিন্তু পাঠকদিগের কথা মনে রাখিয়া*

তাহা করিতে পারি নাই। বইখানি ছাপরা জেলে লিখা হইয়াছিল?'' [১৭]

বইটি সমাজ, ধর্ম, ঈশ্বর, সদাচার, জাতিভেদ এবং শোষক শ্রেণি নামক ছয়টি অধ্যায়ে ভাগ করা হলেও মূল সুর এক, আর তা হল সমাজের অন্যায় ও শোষণের স্বরূপ উন্মোচন ও প্রতিবাদ। যদিও ধর্ম, ঈশ্বর, সদাচার, জাতিভেদ, শোষক শ্রেণি সবগুলো এ সমাজেরই প্রপঞ্চ কিন্তু গুরুত্ব বিচারে প্রতিটি পৃথকভাবে আলোচনার দাবী রাখে বৈকি! প্রকৃতিতে লড়াই করে বেঁচে থাকার তাগিদে মানুষ প্রতিষ্ঠা করেছিল সমাজ। সমাজের শক্তিকেই কাজে লাগিয়ে মানুষ পৃথিবী নামক এই গ্রহটিতে রাজত্ব করছে। কিন্তু যে সমাজকে মানুষ গঠন করেছিল নিজ প্রজাতিকে বাইরের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য, যে সমাজকেই ব্যবহার করে তারা আজ এমন ব্যবস্থা তৈরি করেছে যে মানুষ নিজেই নিজের শত্রুতে পরিণত হয়েছে। সমাজের কর্তব্য ছিল, মানুষের প্রতি সুবিচার করা অথচ এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে আর তার ফল ভোগ করে অশিক্ষা ও অপমৃত্যু। তাদের বাস সমাজের নোংরা বসতিতে, পরনে মলিন কাপড়। তাদের উৎপাদিত ধানে প্রথম অধিকার জমায় অলস ও অপদার্থ মহাজন মালিক শ্রেণি। তারপর অধিক বেতনভোগী কর্মচারী ও পুরোহিতেরা। এখানেই শেষ নয়, ধানোৎপাদনকারী কৃষক শ্রমিকদের পদে পদে জোটে অপমান ও গ্লানি। শোষকরা উঠতে বসতে তাদের গালি দেয়। এ সমাজ আপাদমস্তক অন্যায় অবিচারে ভরা। রাহুলের ভাষায়—

''বাহিরে ধর্মের মুখোশ, সদাচারের অভিনয়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের তামাশা এই দিকে ভিতরে জঘন্য কুৎসিৎ কার্যকলাপ। ধিক্ এই সমাজকে, নিপাত যাক এই সমাজ।'' [১৮]

ধর্ম সমাজের সবচেয়ে পুরনো ও অবশ্যম্ভাবি প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি।

এর সৃষ্টি হয়েছিল শান্তির মুখোশ পরে কিন্তু শান্তি রক্ষায় এর কোনো ভুমিকা নেই। বরং পৃথিবীতে যতগুলোই অশান্তি হয়েছে তার প্রায় সবগুলোই সরাসরি ধর্মের জন্য নতুবা ধর্মকে অবলম্বন করে। 'নতুন মানব সমাজ'-নামক বইটি আকারে ক্ষুদ্র কিন্তু আবেদনে বিশাল। এই বইয়ের মাধ্যমে রাহুল সংস্কৃত্যায়ন পুরোপুরি অন্যায়ে ডুবে থাকা এই সমাজের প্রতি আঘাত হেনেছেন দৃঢ়ভাবে। বইটি পড়ার সময় প্রতিমুহূর্তে মনে হবে, শঠতায় ভরা এই কৃত্রিম সমাজকে ভেঙে চুরে নতুন মানব সমাজের সূচনাটা কত জরুরী! শোষকদের উচ্ছেদ মানবতা তো বটেই মানব প্রজাতিকে রক্ষা করার জন্য কতটা অনিবার্য! রাহুলের কথায়—

> *"সে সময়ে মনুষ্যজাতি তাহাদের মধ্যে প্রথম শোষক সৃষ্টি করিয়াছিল সেই সময় কি সে জানিত যে সেই শোষকেরাই বৃদ্ধিলাভ করিয়া তাহাকে আজ এই দুর্দিনের সম্মুখীন করিবে? ইহার বিনাশ ছাড়া বিশ্বের কল্যাণ নাই। শোষকগণ তোমরা ধ্বংস হও!"* [১৯]

ভারতবাসীর মধ্যে সবচেয়ে বড় বিভাজন ধর্ম জাতপাত ভাষার দিক থেকে নয়। বিভাজনটা হাস্যকর মনে হলেও এর মধ্যে সত্যতাও রয়েছে। ভারতবাসী একদল থাকেন ইন্ডিয়ায়, আরেকদল থাকেন ভারতে। সমাজতাত্ত্বিক দিক থেকে দেখলে এমন মস্করার মোদ্দা মানে হল ভারতবর্ষের মধ্যে দুটো ভারত আছে। সমাজবিজ্ঞানের পরিভাষা ব্যবহার করলে উচ্চবর্গের ভারত আর নিম্নবর্গের ভারত। ইতিহাস-সমাজবিজ্ঞানের আলোচনায় 'নিম্নবর্গ চর্চা' বর্তমানে অতীব গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। এমনকি ইতিহাস সমাজবিজ্ঞানের পরিসর থেকে সাহিত্য আলোচনার সীমাতেও নিম্নবর্গ চর্চার গুরুত্ব এখন প্রতিষ্ঠিত। প্রথমে ইতিহাস সমাজবিজ্ঞানের আলোচনায় নিম্নবর্গ চর্চার দিশাটি কী রূপে মান্যতা পেয়েছে

সে সম্পর্কে স্পষ্ট একটা ধারণা জরুরী।

গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভ্যাক ১৯৮৫ সালে লেখা প্রবন্ধে দুটিতে প্রস্তাব দিয়েছিলেন 'সবার উপরে নিম্নবর্গ সত্য'-এরকম মন্ত্র না জপ করে নিম্নবর্গের ঐতিহাসিককে চেষ্টা করা উচিত উচ্চবর্গের অপর হিসাবে নিম্নবর্গকে কীভাবে নির্মাণ করা হয়? সেই প্রক্রিয়া গুলোকে আরো গভীরভাবে অনুসন্ধান করা। হাজার আওয়াজের ভেতর থেকে নিম্নবর্গের নিজস্ব কণ্ঠস্বর আলাদা করে বের করে আনার চেষ্টা পন্ডশ্রম মাত্র। ইতিহাসের দলিলে যে কণ্ঠস্বরই শুনিনা কেন তা নিম্নবর্গের কথা নয়, অন্যের নির্মাণ। এই নির্মাণের সামাজিক পদ্ধতিগুলি কী? কোন কোন প্রতিষ্ঠানের ভেতর দিয়ে তা তৈরি হয়? কেন প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তা ব্যাপকভাবে সামাজিক স্বীকৃতি পায় সে সব প্রক্রিয়াগুলি আবিষ্কার করায় নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তাঁদের কাছে সেটাই সবচেয়ে বাস্তবোচিত প্রত্যাশা। সাব-অলটার্ন স্টাডিজ-এর পঞ্চম ও ষষ্ঠ খন্ড থেকে গবেষণার নতুন ঝোঁক দেখা দিতে শুরু করে। আগের সঙ্গে পরের পর্বের প্রধান তফাৎ এইখানে যে ঐতিহাসিক গবেষণা থেকে নিম্নবর্গের সত্তা বা চৈতন্যের একটা বিশুদ্ধ পরিপূর্ণ চেহেরার বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়, এই অতি সরল ধারনাটি পরিত্যক্ত হল। নিম্নবর্গের ইতিহাস আংশিক, অসংলগ্ন, অসম্পূর্ণ, তার চেতনা ও বহুধাবিভক্ত ক্ষমতাশীল আর ক্ষমতাহীন নানা শ্রেণি চৈতন্যের বিভিন্ন উপাদনের তা সংমিশ্রণ—এই সিদ্ধান্তগুলিকেও এখন অনেক গুরুত্বের সঙ্গে স্বীকার করা হল। দৈনন্দিন জীবন যাপনে কৃষক চৈতন্যের স্বরূপ সন্ধানে জরুরী হয়ে পড়ল। এবং এই প্রশ্নগুলি এসে পড়তে দেখা গেল, প্রচলিত সমাজবিজ্ঞান ইতিহাস চর্চার প্রায় প্রতিটি বিষয় নিয়েই 'সাব-অলটার্ন' এর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে একটা নতুন অনুসন্ধানের পথ খুলে যাচ্ছে। প্রশ্ন এখন আর থাকেনি যে— নিম্নবর্গের প্রকৃত স্বরূপ কী? প্রশ্নটা হয়ে গেল নিম্নবর্গকে রিপ্রেজেন্ট করা হয় কীভাবে? রিপ্রেজেন্ট কথাটা এখানে 'প্রদর্শন করা' আর 'প্রতিনিধিত্ব করা' উভয় অর্থেই প্রযোজ্য। উচ্চবর্গের অপর হিসাবে নিম্নবর্গের

ধারণার নির্মাণ—এই বিষয়টি সাব-অলটার্ন স্টাডিজ এর গোড়া থেকে চর্চিত হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তখন অনুমানটি এমন ছিল যে সঠিক ভাবে বিশ্লেষণ করতে পারলে উচ্চবর্গের নির্মাণের খোলসটি খসে পড়বে, প্রকৃত নিম্নবর্গের স্বরূপ চোখের সামনে ভেসে উঠবে।

'নিম্নবর্গ ধারনাটিকে তার পোক্ত জমির ওপর আরও কংক্রিট হতে সাহায্য করেছে 'নকশাল আন্দোলন' ১৯৬৭ সালে মার্চ মাসে শিলিগুড়ি মহকুমার নকশালবাড়ি অঞ্চলে নকশাল আন্দোলনের সূচনা হয়, যার মূল কথা ছিল কৃষককে শোষণের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেওয়া। শিলিগুড়ি তথা দার্জিলিং জেলার কৃষকদের জেহাদ অচিরেই হিংসাত্মক বিপ্লবে পরিণত হয়। উচ্চবিত্ত তথা ক্ষমতাশীলদের ক্ষমতা চূর্ণের জন্য জোতদারদের জমির আধিপত্য বিনষ্ট করার জন্য এবং কৃষকদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করার অভিপ্রায়ে এই আন্দোলনের সূত্রপাত। গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের বিপ্লবকে গুরুত্ব দিয়ে দেশের জাড্য অবস্থানকে ধ্বংস করা ছিল আন্দোলনের ব্রত। কিন্তু ক্রমাগত দমন-পীড়নে নকশালবাদীদের এই বিপ্লব ১৯৭২ সালেই স্তব্ধ হয়ে যায়। নকশালবাড়ি কৃষক আন্দোলনের ঘাত-প্রতিঘাত ক্ষণস্থায়ী হলেও, এবং আন্দোলনকারীরা নিজস্ব ক্ষমতাপূরণে ব্যর্থ হলেও জাতীয় রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক অসাম্য, কৃষকদের অসহায়তা ইত্যাদি প্রশ্নগুলি রাজনৈতিক মঞ্চকে ভাবিয়ে তুলতে বাধ্য করেছিল। কিন্তু আন্দোলনকারীদের স্বপ্ন আদর্শ, সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর একাকী, আত্মগ্লানিপূর্ণ, ভাঙাহৃদয়ে, জীবনে এক কোনে নষ্টালজিয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে থাকে। আর এভাবে তারা নিম্নবর্গের আখ্যা পায়। তারা ভূমিহীন কৃষক, পায়ের তলার মাটি যাদের নেই, নতুন স্বপ্নও তারা দেখতে পারেনা। তবুও তারা তাদের হারানো স্বপ্নকে বুকে নিয়ে, ক্ষতবিক্ষত যন্ত্রণা নিয়ে বেঁচে থাকে এই আশায়, হয়তো একদিন কোনো সমাজ, সংগঠন সরকার তাদের দুঃখ কষ্ট অনুভূতিকে বুঝবে এবং তাদের বিপ্লব সাফল্য পাবে।

'নিম্নবর্গের নির্মাণ' এই প্রশ্নটিকে সামনে রাখার ফলে এবার

ঔপনিবেশিক ভারতে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা এবং আধুনিক সমাজ প্রতিষ্ঠান গড়ার জটিল ইতিহাসের দলিল সম্পূর্ণ অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে পড়ার প্রয়োজন দেখা দিল। ফলে ঔপনিবেশিক শাসনযন্ত্রের প্রসার ও ইংরেজি শিক্ষা, তথাকথিত নবজাগরণ, জাতীয়তাবাদের উন্মেষ, এইসব বহুচর্চিত বিষয় নিয়েও সাবলটার্ন স্টাডিজ এ নতুন করে আলোচনা শুরু হল। সেই সঙ্গে নজর গিয়ে পড়ল আধুনিক রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উপর। যার মাধ্যমে নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞান সঞ্চারিত মতাদর্শ এবং আধুনিক ক্ষমতাতন্ত্র ঔপনিবেশিক এবং পরবর্তীকালে স্বাধীন ভারতবর্ষে তার জাল বিস্তার করেছে। অর্থাৎ স্কুল, কলেজ, রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স, আধুনিক শিল্প উৎপাদনে দৈনন্দিন শ্রমসংগঠন, বিজ্ঞান সংস্থা, গবেষণাগার এইসব প্রতিষ্ঠানের বিষদ ইতিহাসও এবার 'সাব-অলটার্ন স্টাডিজ' এর বিষয় হয়ে পড়ল। নিম্নবর্গকে নায়ক হিসাবে দাঁড় করিয়ে এসে সাদা মাটা ঐতিহাসিক রোমান্সের বদলে পাঠকের সামনে এবার এসে পড়ল সরকারি দলিল ইতিহাসের পাঠপুস্তক জাতয়ীতাবাদী নেতার বক্তৃতা, সমাজবিজ্ঞানের প্রবন্ধের খুঁটিনাটি চুলচেরা বিশ্লেষণ। অনেকেই বললেন, নিম্নবর্গের ইতিহাস এবার ভদ্রলোকের ইতিহাস হয়ে যাচ্ছে। আলোচনার লক্ষ্যবস্তু নিম্নবর্গের ক্রিয়াকলাপ থেকে ছাড়িয়ে রাষ্ট্রের অন্যসব এলাকাতে পৌঁছে যাওয়ায় একটা অসুবিধা হচ্ছিল। সমাজ বিজ্ঞানের চর্চার জগতে প্রথম আলোচনাটা কেটে যাওয়ার পর সাব-অলটার্ন স্টাডিজ-এর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক জায়গা যেন নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়তে গিয়ে ঔপনিবেশিক জাতীয়তাবাদ মার্কসবাদী ইতিহাস রচনার পাশাপাশি 'সাব-অলটার্ন স্কুল' নিয়ে খানিকটা পড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। এখন দেখা গেল, সাবলটার্ন স্টাডিজ এর কোনো নির্দিষ্ট বিষয়গত সীমারেখা থাকছে না। সব বিষয় নিয়েই সেখানে লেখালেখি শুরু হয়ে গেছে। আপত্তিটা অনেকটা এরকম হয়ে দাঁড়াল—বেশতো তোমরা চাষাভূষো কুলিকামিন নিয়ে লিখেছিলে। এখন হঠাৎ বঙ্কিম গান্ধী-জওহরলাল-বিজ্ঞান-শিল্প-সাহিত্য নিয়ে লিখতে শুরু করলে

কেন? এই আপত্তি এখনো শুনতে পাই।

আসলে 'নিম্নবর্গের' নির্মাণ এই পদ্ধতিগত আবিষ্কারটির পর নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকের কাজ আর কেবল নিম্নবর্গের স্বতন্ত্র ক্রিয়াকলাপের বিবরণ দেওয়াতেই সীমাবদ্ধ থাকে নি। যে কোনোও প্রতিষ্ঠিত অথবা প্রতিষ্ঠার অভিলাষী ক্ষমতাতন্ত্রের সমালোচনায় 'সাব-অলটার্ন স্টাডিজ'-এর ভেতর সম্ভব। তার মানে কিন্তু এই নয় যে 'সাব-অলটার্ন স্টাডিজ' এর লেখক বা পাঠক হিসাবে সমসাময়িক রাজনৈতিক বাদানুবাদে যোগ দেওয়ার পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি উচ্চবর্গের রাজনীতি বা মতাদর্শের ভেতর নিম্নবর্গের প্রতিকল্পটিই কীভাবে নির্মিত হয়েছে, সেই বিষয়টি এখন অনেক স্পষ্টভাবে নজরে আসার ফলে উচ্চবর্গীয় রাজনীতির বিবাদে ভিন্নতর অবস্থান নেওয়া অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয়েছে। সাম্প্রতিক পর্যায়ের সাব-অলটার্ন স্টাডিজ এর আলোচনায় অন্তত তিনটি সামাজিক রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে উল্লেখযোগ্য আলোচনা হয়েছে বলে মনে করা যায়। তিনটি ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠিত জাতীয়তাবাদি ও বামপন্থী রাজনৈতিক গোষ্ঠীদের পারস্পরিক বিতর্কে নিম্নবর্গীয় রাজনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে নতুন মাত্রা যোগ করা গিয়েছে। প্রথমটি 'সাম্প্রদায়িকতা'। এই নিয়ে অধিকাংশ আলোচনায় দুটি বিবাদমান গোষ্ঠীর মধ্যে হয়েছে। একটি হিন্দুত্ববাদি অন্যটি সেকুলারপন্থী বা ধর্মনিরপেক্ষবাদি। দরিদ্র এবং শোষিত হলেই তারা সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরোধী এবং সেকুলার রাজনীতির সমার্থক হয়। এটি অতি সরল সিদ্ধান্ত নিম্নবর্গের ঐতিহাসিক প্রথমেই খারিজ করে দেবেন।

দ্বিতীয় বিষয়টি নিয়ে 'সাব-অলটার্ন স্টাডিজ' এ উল্লেখযোগ্য আলোচনা এর আগে হয়েছে। 'ডিসকোর্স' হিসাবে দেখার ফলে জাতপাত নিয়ে সাম্প্রতিক রাজনীতির একটি দিক অনেক স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছে; তা হল জাতিভেদ প্রথায় ধর্মীয় ভিত্তি এখন প্রায় সম্পূর্ণ লুপ্ত। কেউ তা নিয়ে আর কথা বলে

না। তৃতীয় বিষয়টি হল 'মহিলাদের সামাজিক স্বীকৃতি ও অবস্থান' বিষয়ে আলোচনা। পুরুশাসিত সমাজে সব নারীই এক অর্থে নিম্নবর্গ। তাই বলে নারীর কোনো শ্রেণিজাত, জাতিগত, সম্প্রদায় পরিচয় নেই এও সত্য। সুতরাং নিম্নবর্গের নির্মাণ দেখতে হলে পুরুষশাসিত সমাজে নারীর অধীনতাও যেমন বিশ্লেষণের বিষয়, তেমনি অন্যান্য ক্ষমতার সম্পর্ক যেমন শ্রেণি, জাতি, সম্প্রদায় ইত্যাদি কীভাবে সেই নিম্নবর্গীয় নারীর নির্মাণটিকে আরও জটিল করে তোলে, তাও বিশেষ গবেষণার বিষয়। সাম্প্রতিক বিতর্কে সমাজ সংস্কার এবং বিশেষ করে নারীর অধিকার রক্ষার জন্য আইনের সংস্কার নিয়ে প্রচুর আলোচনা চলেছে। কিন্তু সামগ্রিক অর্থে নারীর অধীনতা আর বিশেষ অর্থে নিম্নবর্গীয় নারীর অধীনতা পরস্পর সম্পর্কিত হলেও যে দুটি ভিন্ন বিষয়, এই সত্যটি তুলে ধরার ফলে সাম্প্রতিককালে ভারতের নারীবাদী রাজনীতির বিতর্কে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে।

উক্ত তিনটি ক্ষেত্রেই নিম্নবর্গের রাজনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিষ্ঠিত জাতীয়তাবাদি ও প্রতিষ্ঠিত বামপন্থী রাজনীতির সমালাচনা তৈরি হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর সিংহভাগ ধরে যে উচ্চবর্গীয় রাজনীতি ভারতের রাষ্ট্রযন্ত্রকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল, আগামী দিনে তার বিরোধী শক্তি হয়তো এই সব সমালোচনাকে অবলম্বন করেই সংগঠিত হবে। বামপন্থী ভাবনাচিন্তার জগতে অন্যদের তুলনায় 'সাব-অলটার্ন স্টাডিজ' যে সেই সম্ভাবনাকে অপেক্ষাকৃত বেশি তাত্ত্বিক স্বীকৃতি দিতে পেরেছে, তার প্রধান কারণ হয়তো এই যে, পদ্ধতির দিকদিয়ে অত্যন্ত মৌলিক সমালোচনা এবং দিক পরিবর্তনও এখানে নিষিদ্ধ হয়নি। নিম্নবর্গের ইতিহাস যেমন অসম্পূর্ণ পরিবর্তনশীল, নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চাও ঠিক তেমনি আরও সচল রাখার চেষ্টা করা প্রয়োজন। এই অর্থে এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই ইতিহাসচর্চায় নিম্নবর্গের সংগ্রামের যথার্থ প্রতিনিধিত্ব দেওয়ার প্রয়াস চলেছে। আমাদের আলোচনায় আমরা নিম্নবর্গের নিরিখে অভিজিৎ সেনের উপন্যাস বিশ্লেষণে

অগ্রসর হব। অভিজিৎ সেন তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে কীভাবে নিম্নবর্গীয়দের অঙ্কন করেছেন, তাদের অবস্থান কি? আর্থ-সামাজিক সমাজ ব্যবস্থায় তারা কিভাবে দিনপাত করছে। শোষণ, যন্ত্রণা, বঞ্চনা, লাঞ্ছনা এবং প্রতিরোধ ও প্রতিবাদ কীরূপে আছে তা আমাদের আলোচনার মূল বিষয়। আধুনিক ও সাম্প্রতিক নিম্নবর্গীয় ধারণা ও গবেষণার নিরিখেও আমরা অভিজিৎ সেনের উপন্যাস নিয়ে গভীর আলোচনায় অংশ গ্রহণ করব।

তথ্যসূত্র :

১. 'বিড়াল', বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ, বিশ্বভারতী, প্রকাশ জুন- ২০০৬, পৃঃ ১৯

২. তদেব, পৃঃ ২০

৩. **Samsad English-Bengali Dictionary, P- 1126, Fifth edition**

৪. ভূমিকা : নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার ইতিহাস, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৯৯৮ খ্রিঃ, পৃঃ ৩

৫. বিপ্লব মাজী, অভিমুখ, সন্ধান (একটি গবেষণা পত্রিকা), প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, দিয়া পাবলিকেশন, ২০১৩, পৃঃ ৭১

৬. 'লোকহিত', কালান্তর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, কার্তিক ১৪০৯, পৃঃ ৪৫

৭. 'জমিদার— বঙ্গদেশের কৃষক', বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদনা- ভুটান ঘোষ, ১৪১২ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ১৫৮

৮. বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ৭ম সংস্করণ, মডার্ন বুক এজেন্সি, পৃঃ ১৩৯-১৪০

৯. কবি কঙ্কনচণ্ডী- ১ম ভাগ, নতুন সংস্করণ, পুনমুদ্রিত- ১৯১৬, সম্পাদক- শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বপতি চৌধুরী, পৃঃ ২৯০

১০. বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ৭ম সংস্করণ, মডার্ন বুক এজেন্সি, পৃঃ ১৫০

১১. 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস', আশুতোষ ভট্টাচার্য, দশম সংস্করণ, পুনমুদ্রণ : এপ্রিল ২০০২, পৃঃ ৭৮৬

১২. 'অন্নপূর্ণা ও ঈশ্বরী পটনি', রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, পাঠসংকলন, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি- ২০০৫, পৃঃ ১০

১৩. ভট্টাচার্য সুকুমারী : প্রাচীন ভারতের ধর্মচিন্তার বিবরণ : ইতিহাস অনুসন্ধান-৩, সম্পাদনা- গৌতম চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা- ১৯৮৮, পৃঃ ০৫

১৪. 'বঙ্গদেশের কৃষক', বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিমচন্দ্র, সম্পাদনা- ভুটান ঘোষ, ১৪১২, পৃঃ ১০০

১৫. 'রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষ— কালান্তর ও অন্যান্য রচান', জীবেন্দু রায়, গ্রন্থবিকাশ, বইমেলা ২০১০, পৃঃ ১

১৬. সাক্ষাৎকার, মোহাঃ আমিরুল ইসলাম, ছাতাকল-দমদম, কলকাতা, তারিক-০৬.০৮.২০১২

১৭. 'তুমহারি ক্ষয়' (নতুন মানব সমাজ), রাহুল সংস্কৃত্যয়ণ, তথ্যজাল, লেখক-কবীন নয়ন, তারিখ- ০৪.০৩.২০১৩

১৮. 'তুমহারি ক্ষয়' (নতুন মানব সমাজ), রাহুল সংস্কৃত্যয়ণ, তথ্যজাল, লেখক-কবীন নয়ন, তারিখ- ০৪.০৩.২০১৩

১৯. 'তুমহারি ক্ষয়' (নতুন মানব সমাজ), রাহুল সংস্কৃত্যয়ণ, তথ্যজাল, লেখক-কবীন নয়ন, তারিখ- ০৪.০৩.২০১৩